চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ও বালুরঘাটের অন্যান্য দলের অবির্ভাব

নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় বটে। কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চের বাইরে আর একটা বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ আছে যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে সংঘাত ও বিপর্যয়। সেই বিষয়টি শিল্পীর মানস লোক থেকে তা শিল্পাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকের কল্পনা ও নাট্যশিল্পের অভিনয় জীবনের যে শৈল্পিক রূপ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার মূলে রয়েছে বাস্তবজীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের জীবনকে ওলট পালট করে দিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ বিভাগ ইত্যাদি ঘটনা বাঙ্গালীর সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সাধারণ মানুষ যখন দুর্ভোগের শিকার হয়েছে তখন মুনাফালোভী, দালালী, ঠিকাদার অসাধু ব্যবসায়ী তাদের তহবিলে অর্থ ঠেসে ঠেসে রেখেছে। যুদ্ধান্তে স্বাধীনতার সময় দেশবিভাগের ফলে দুর্যোগ নেমে এসেছিল বাঙ্গালীর শাশ্বত জীবনে। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি দেখা দিল। পারিবারিক জীবনে লজ্জা, শালীনতা কিছু থাকল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শুধু যে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিবর্তন ঘটল তা নয়, যুদ্ধ মন্বন্তর, বাস্তুত্যাগ আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। জমিদারী ব্যবস্থা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যসত্ত্ব ভোগী বহুলোক গ্রামের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করে শহরে নতুন নতুন বৃত্তি অবলম্বন করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ লুপ্ত হয়ে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। একান্ন পরিবার ছিন্ন হল, নারী পুরুষ উভয়ই অর্থ উপার্জনে বহির্বিশ্বে পদচারণ করেছে, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, অধিকার লাভের প্রচেষ্টায় মানুষ দিক ভ্রান্ত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন।

চারের দশক উত্তাল সময়ে আন্দোলিত। ১৯৪০ মুসলিম লিগের পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ, ১৯৪১ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু অন্তর্হিত হল ভারত বর্ষ থেকে, ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন, ১৯৪৩ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিটল বটে, বাঙ্গালী উপলব্ধি করেছিল ফ্যাসিবাদের উত্থান, বিস্তার ও পরাজয়ের পরিনাম। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- বাঙ্গালীর মনুষত্ব্যের যেটুকু বেঁচেছিল তারও অপমৃত্যু ঘটল। এই দশকেই তৈরি হয়েছিল ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ (১৯৪২)। উক্ত সংঘের একটি শাখা হল ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ (১৯৪৪)। ১৯৪০ সালের ঘটনাপ্রবাহ মন্বন্তরের ভয়াবহ পরিবেশে অসহায় মানুষের মনের কথাটি তুলে ধরেছি বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ (১৯৪৪ সালে শ্রীরঙ্গমে)

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে মানুষ সাময়িক শান্তি লাভের পরেই আবার শুরু হল নানা রকমের আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে কনিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৫০ সাল থেকেই বাঙ্গালীরা নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। মানুষ অসহায় হয়ে পড়ল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাস ভঙ্গ হল। শুরু হল নানা রকম মিছিল, মিটিং, আন্দোলন। বন্দীমুক্তি আন্দোলন থেকে খাদ্য আন্দোলন মানুষকে নতুন জীবন গড়ার পথ দেখাল। এরপর আসল

ভাষা আন্দোলন। সমস্ত বিষয় মিলে যুদ্ধ অন্তে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও বাঙ্গালী জীবন বিপর্যস্ত ছিল। এই সময়ে গণনাট্য সংঘের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও প্রচারমুখী নাটক পরিবেশন থেকে বিরত থাকল একদল শিল্পী। তাঁরা নাটককে শিল্প বর্জিত করতে চাইলেন না। গড়ে তুললেন নবনাট্য আন্দোলন। শম্ভু মিত্র গড়লেন 'বহুরূপী' (১৯৪৮), বিজন ভট্টাচার্য্য 'নাট্যচক্র' ও 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৯৫০,১৯৫১) তরুণ রায়ের 'থিয়েটার সেন্টার' (১৯৫৪) সবিতা ব্রত দত্তের 'রূপকার' (১৯৫৫) উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার', শ্যামল ঘোষর 'গন্ধর্ব', পার্থ প্রতিম চৌধুরী ও মনোজ মিত্রের 'সুন্দরম', বীরেন মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা দাসের 'শৌভনিক' (১৯৫৭), শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'থিয়েটার ইউনিট' (১৯৫৮) অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নান্দীকার' (১৯৬০) প্রভৃতি। গ্রুপ থিয়েটার গুলি নাট্য আন্দোলনে জোয়ার আনল।

এই নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় পিছিয়ে থাকল না বালুরঘাট। 'তরুণতীর্থ' (১৯৫২), 'ত্রিশূল'(১৯৫৯), 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯), 'লোকায়ন নাট্য সংস্থা' (১৯৭২), তূণীর' (১৯৭৩), 'রূপান্তর' (১৯৭৬) প্রভৃতি। আর বালুরঘাট নাট্যমন্দির (১৯০৯) সে তো তৈরি হয়েছিল সখের থিয়েটার হিসেবে। নাট্য মন্দিরের কলাকুশলীগন যুগের প্রয়োজনেই হোক কিম্বা যুগ তাড়িত হয়েই হোক তাঁরা যুগোপযোগী নাটক পরিবেশন করেছেন এবং গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা পাল করছেন।

বালুরঘাটের গ্রুপ থিয়েটারে অভিনীত নাটক গুলি সম্পর্কে জানতে হলে বালুরঘাটের তৎকালীন পরিস্থিতি জানা প্রয়োজন। বালুরঘাট শহরের রঙ্গমঞ্চ গুলিও উক্ত সময় পরিস্থিতিকে পরিহার করতে পারেনি এবং চারের দশকের পূর্বেরও স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল বালুরঘাটবাসীর। ক্ষুদ্র পরিসরে বহু স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল বালুরঘাটে। বালুরঘাট তথা দিনাজপুরে স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২৩), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), ছত্রিশা আন্দোলন, তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) উক্ত সমস্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে বালুরঘাট এছাড়া চারের দশকের অস্থিরতা যেমন মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পায়নি বালুরঘাটবাসীও। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই দক্ষিণ দিনাজপুরে সংগঠিত হয়েছে কাকনা ডাকাতি, তিলনী ডাকাতি, হিলি মেল ডাকাতি। যদিও উক্ত বিষয় গুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক কারণ বালুরঘাটের জনসাধারণ (দর্শক) অভিনেতা-অভিনেত্রী নাট্যকর্মী ও মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। বহু অভিনেতা ছিলেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী আবার নাট্য শিল্পীও বটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জয়-পরাজয়ের পরিণাম, স্বাধীনতালাভ, স্বাধীনতালাভের পরও সাধারণ মানুষের স্থান পরিবর্তনের (অনেকের) ফলে দুর্ভোগ ইত্যাদি বিষয় গুলি উঠে এসেছিল সমসাময়িক লেখকের লেখনীতে। কবিতা উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি সাহিত্য শাখার সঙ্গে নাটক শিল্প প্রকরণটিও উক্ত সামাজিক বিষয়গুলি গ্রহণ করেছিল। বোধহয় নাটকই উৎকৃষ্ট মাধ্যম যা জনসাধারণকে খুব সহজেই সচেতন করতে পারে। নাটককার, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চ ও দর্শকের সম্মিলিত প্রয়াসেই তা সম্ভব হয়। তাই বালুরঘাটের গ্রুপথিয়েটার

গুলিতেও দেখা যায় - তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা', ড: মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর', জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল', উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' ইত্যাদি।

কিন্তু দেখা যায় কলকাতার পেশাদার নাট্যসংস্থা গুলি বিশেষ কিছু অনুভব করতে পারেনি। তারা অভিনয় করে চলেছিল গতানুগতিক নাটক সমূহ। পেশাদারী সংস্থার অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল হতাশা, বিপর্যয়, অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী মানুষের কথা। স্টার থিয়েটার ১৯৫৩ সালে 'শ্যামলী' প্রযোজনা করল। মিনার্ভাতে দেখা গেল ১৯৫৫ সালে 'এরাও মানুষ'। বিশ্বরূপাতে ১৯৫৯ সালে 'সেতু' অভিনীত হল। এই সমস্ত নাটকে জীবন সংগ্রামের কথা নেই।

গণনাট্য সংঘ এবং তার পরবর্তীতে গ্রুপ থিয়েটার জীবন ভাবনার এই পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সেই সময়ে মানুষের জীবন সংগ্রাম, ক্ষোভ, আন্দোলন মূর্ত হয়ে উঠল তাদের নাটকে। উত্তর সারথির 'নতুন ইহুদি' নাট্যচক্রের 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা', প্রান্তিক এর 'রাহুমুক্ত', গণনাট্য সংঘের 'দলিল', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'বাংলার মাটি', 'গোলটেবিল' প্রভৃতি। পেশাদার রঙ্গালয়গুলি পশ্চাদমুখীনতায় নিজেদের ব্যস্ত রয়েছে তখন গণনাট্য সংঘ ও গ্রুপ থিয়েটার নতুন জীবনভাবনার মুখোমুখি হল।

পাঁচের দশকে পেশাদার থিয়েটার যখন অভিনীত হচ্ছে 'সাহেব বিবি গোলাম', 'এক পেয়ালা কফি', 'শ্যামলী', 'আরোগ্য নিকেতন', এর মত কাহিনী নির্ভর নাটক বহুরূপী (১৯৪৮) তখন করছে 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'দশচক্র', 'পুতুলখেলা', যাদের বিষয় আর প্রকাশভঙ্গি পেশাদার থিয়েটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেবলমাত্র আলোক সম্পাদ, মঞ্চ নির্মাণ কিংবা উন্নত মানের অভিনয়ের জন্যই নয়, নাট্য বিষয় ভাবনার আধুনিক ও সাম্প্রতিক উপস্থাপনা জনমানসকে আকৃষ্ট করেছিল।

ছয়ের দশক, বাংলা উত্তাল। ১৯৬২ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৬৬৫ ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ, ১৯৬৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেল, ১৯৬৭ খ্রী: থেকে নকশাল আন্দোলন শুরু। ১৯৬২ খ্রী: নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হল। এই সময়ে শ্যামল ঘোষের 'নক্ষত্র' (১৯৬৬), বিভাষ চক্রবর্তীর 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' (১৯৬৬), বাদল সরকারের 'শতাব্দী' (১৯৬৭) লিটল থিয়েটার গ্রুপ ভেঙ্গে তৈরি হল 'পিপলস্ থিয়েটার গ্রুপ' (১৯৬৯) সেই সঙ্গে বালুরঘাটে তৈরি হল 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯)। কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বালুরঘাটের গ্রুপ থিয়েটার গুলিতে সমমানের নাটক অভিনীত হতে থাকে।

ছয়ের দশকের পূর্বে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট চোখে পড়েনি। তবে মফ:স্বল এলাকায় সেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই যে নাটক পরিবেশিত হচ্ছে সেই উৎসাহ ও আগ্রহের কোনো ভাটা পরেনি। ছয়ের দশক থেকে দর্শক কুলের চাহিদার পরিবর্তন হয় ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও নৃত্য নাট্যের মধ্যে জড়িয়ে থাকার দিনও শেষ। ছয়ের দশক থেকেই গতানুগতিক অভিনয় রীতি বর্জন করে নতুন রীতি নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষায় সামিল হয় নাট্যমন্দির, আলোকম্পাত, আবহ সঙ্গীত, শব্দানুষঙ্গ, নাটক নির্বাচন প্রভৃতি

বিষয়েই নতুনত্ব নিয়ে আসে। মালদা থেকে এসেছিলেন পুরোষত্তম সোমানী যিনি ছিলেন নাট্যপ্রেমী ও দক্ষ অলোক শিল্পী। তিনি ১৯৭০ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্য হন এবং এর পর থেকে বালুরঘাটের নাটকে আলোক সম্পাতে অভিনবত্ব আসে। 'ঝুমুর' 'ফেরারী ফৌজ' প্রভৃতি নাটকে অসাধারণ আলোর ব্যবহার করেছেন তিনি। নাট্যমন্দির বরাবরই অনুবাদ নাটকের পক্ষপাতিত্ব কম করত। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেগেছিল আধুনিকতার ছোয়া। সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক পরিবতর্নের চিত্র, রোমান্টিক পরিমন্ডলের মধ্যে যন্ত্রণার সমাধানের ছবি, মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়- এ সবই হয়ে উঠেছিল নাটকের বিষয়বস্তু। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় 'ফেরা' নাটকের পরিচয় পত্রে নাটকের সারমর্মটি লক্ষ্য করলে। সেখানে ছিল যে, মানুষের অমরতা লাভের লড়াই আজকের নয়, এ চিরন্তন। মানুষের আত্মবোধনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে এই সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম চলছে, আজ চলছে, আগামী কালও চলবে। 'ফেরা' আগামী কালের মানুষের সেই চিরন্তন লড়াই। ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নাটকের জোয়ার বয়ে গেছে। বিশেষ করে সাতের দশকে এক দিকে নাট্যমন্দির অন্যদিকে 'ত্রিতীর্থ' পাল্লা দিয়ে নাটক প্রযোজনা করেছেন,- 'চারপ্রহর'(১৯৬৭), 'ছায়ানায়িকা'(১৯৬৭),'কেয়াকুঞ্জ' (১৯৬৭), 'সোনার হরিণ'(১৯৬৮), 'ছেঁড়াতার' (১৯৬৯), 'কালোমাটিক কান্না' (১৯৭০), 'লৌহকপাট'(১৯৭২), 'শয়তানশ্রী'(১৯৭৩), 'ঝুমুর'(১৯৭২), ফেরারী ফৌজ', 'তাহার নামটি রঞ্জনা' প্রভৃতি।

নাট্যমন্দিরের কোন কোন নাটক নির্বাচনে এবং প্রযোজনায় কলকাতার অনুকরণ দেখা যায়। তাছাড়া স্বতন্ত্র কোন চিন্তা দেখা যায়নি। নাট্যমন্দিরের এমন কোন প্রতিভাবান নাটককার নেই যে নিজেদের নাটক নিজেরাই রচনা ও প্রযোজনা করেছে। এখানে কোন মৌলিক চিন্তার বিকাশ দেখা যায়নি। তবে নাটকের ক্ষেত্রে আগ্রহ, প্রেরণা, আকাঙ্খা জাগাতে নাট্যমন্দিরের যথেষ্ট আবেদন রয়েছে। লক্ষ্মৌ, পাটনা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কৃত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে পাটনায় সারাভারত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় 'ছেঁড়াতার' নাটকটি চারটি পুরস্কার পায়।

১। শ্রেষ্ঠ দল-বালুরঘাট নাট্যমন্দির-
২। শ্রেষ্ঠ পরিচালক -শ্রী বিমল দাশগুপ্ত ও শ্রী সনৎ সেন-
৩। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা -রহিমুদ্দি চরিত্রে শ্রী অমলেশ মিত্র।
৪। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী-ফুলজান চরিত্রে শ্রীমতি কণা সরকার।

লক্ষ্মৌ বেঙ্গলী ক্লাব আয়োজিত 'সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় ১৯৭০' 'ফেরা' নাটকটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (প্রণব মুখোপাধ্যায়) ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর (রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়) পুরস্কার পায়। লোকরঙ্গ (হাওড়া) আয়োজিত 'সারা বাংলা শিশির একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় (১৯৬৯)' 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ও 'কালোমাটির কান্না' পুরস্কৃত হয়। মোট ছয়টি পুরস্কার পেয়েছিল।

'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটক পরিবেশনায়
১। দলগত অভিনয় নৈপুণ্য- প্রথম বালুরঘাট নাট্যমন্দির।

২। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা- শ্রী সনৎ সেন
৩। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা - শ্রী সনৎ সেন
৪। তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়
৫। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী - শ্রীমতি রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী- সমর চট্টোপাধ্যায়। 'কালো মাটির কান্না' নাটক পরিবেশনে।

বালুরঘাটের নাট্যজগতে প্রকৃত আধুনিকতার ছোয়া লাগে ১৯৬৭ সাল থেকে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতা থেকে বালুরঘাটে ফিরে এলেন এবং ১৯৬৭ সালে নাট্যমন্দিরের সদস্য হলেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি 'বহুরূপী', 'নন্দীকার', 'শৌভনিক', 'ক্যালকাটা থিয়েটার', 'নক্ষত্র', 'গন্ধর্ব্য' এই সব দলের নাটক নিয়মিত দেখার ফলে তাঁর নাটক সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা হয়। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাটককার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে নাট্যশিল্প সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরে বেশ কিছু নাটক ('অমৃতস্য পুত্রা:', 'লৌহ প্রাচীর', 'ছায়া নায়িকা', 'চার প্রহর', 'অমৃত অতীত') নাটক পরিচালনা করেছিলেন। তিনি জানতেন নাটক কেমন ভাবে করা দরকার, যুগের প্রয়োজনে নাটকের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু কেমন হওয়া দরকার। পাঁচের দশক পর্যন্ত নাটক মঞ্চায়নে দর্শক চক্ষুর অন্তরালে প্রম্পটারের ভূমিকা ছিল। মুখস্থ করার রেওয়াজ তেমন ছিল না। অভিনেতাদের স্বরপ্রক্ষেপণেও প্রম্পটারের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রথম পাঠ মুখস্থের কথা বলেন। যদিও বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থায় ১৯৫৩ এর দিকে পাঠ মুখস্থ করে 'কেদার রায়' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। ''অমৃতস্য পুত্রা: নাটকের মহড়া। স্থান নাট্যমন্দির। পরিচালক আমি। ফটিকদা অধ্যাপক এবং তাঁর প্রাণপ্রতীম ভাগিনেয় বিল্টু মুখার্জী এক অপ্রধান তরুণের ভূমিকায়। আমার ঘোষণা প্রম্পট ছাড়া নাটক হবে। সাল ১৯৬৭। যেন ব্রজপাত হল। তুমুল প্রতিবাদে মুখর হল ফটিকদা এবং তস্য ভাগিনেয় অসম্ভব। অপ্রচলিত এই কালাপাহারী ব্যবস্থা মান্য করা যাবে না। আমার অনুত্তেজিত ঘোষণা পরিচালক খুঁজে নিন। দু-দিন পরে ফটিকদার অনুনয়- 'চল্‌চল্‌। পার্ট মুখস্থ করব। তবে একটু আধটু যদি' ..... না:, আমার জেদ, প্রম্পট হলে আমি নেই। 'বেশ বেশ, তাই হবে। এখন চল্‌', ফটিকদার অনুনয়।''[১] হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পার্ট মুখস্থের প্রসঙ্গে সাময়িক উত্তেজনা নাট্যমন্দিরে সৃষ্টি হলেও সকলেই তাঁর প্রস্তাব মেনে নেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরে যোগ দেওয়ার পূর্বে ও পরে নাট্যমন্দিরে কেবল বাংলা নাটকের অভিনয় হত। একমাত্র হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ই বিদেশী নাটক (বাংলা নাট্যরূপ) অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেন। বিদেশী নাটক গুলি বাংলায় রূপান্তরিত করা ও অভিনয়ের মধ্যেও রয়েছে শিল্পের স্পর্শ। কিছু দিনের মধ্যেই নাট্যমন্দিরের সঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মত বিরোধ হয় এবং তিনি নাট্যমন্দির ত্যাগ করেন।

বালুরঘাটে কোনো পেশাদার নাট্যসংস্থা নেই। নাট্যমন্দির গণনাট্য - নবনাট্য আন্দোলনের পূর্বে তৈরী হলেও এটা ছিল অ্যামেচার। বালুরঘাটের নাট্যমন্দির প্রগতিশীল নয়, আবার প্রতিক্রিয়াশীল নয়। এটি একটি বিনোদন মূলক প্রতিষ্ঠান। প্রকৃত পক্ষে ''এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলটি স্বাধীনতাকামীদের প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। অন্য দিকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অনেক মানুষই স্বাধীনতার জন্য অহিংস আন্দোলন এমনকি সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী

আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নাট্যমন্দির ছিল তাঁদের বিনোদন ভবন।''[২] নাট্যমন্দির নানা শ্রেণীর মানুষের সমাবেশ ছিল রাজপুরুষ, দরিদ্র, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, খেলোয়ার, প্রশাসনিক স্তরের লোক, কলেজপড়ুয়া প্রভৃতি। একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর আবাস ছিল নাট্যমন্দির। অবশ্য গোষ্ঠী ছাড়া নাটক অভিনয় হতে পারে না। গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের লড়াই অবধারিত ভাবে হয়ে থাকে। দলের আভ্যন্তরীণ লড়াই সংস্থাকে দুর্বল ও নিস্ক্রিয় করে তোলে। বাংলার নাট্যসংস্থার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ভাবে এই টিই সত্য যে ভাঙন ছাড়া যেন নাটকের ইতিহাস পূর্ণ হয় না। 'গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩) থেকে কিছু নাট্য ব্যক্তিত্ব বেড়িয়ে এসে কেউ কেউ স্বতন্ত্র দল গঠন করলেন। শম্ভু মিত্র গড়ে তুলেছিলেন 'বহুরূপী' নাট্য সংস্থা (১৯৪৮)। 'বহুরূপী' থেকে বেরিয়ে আসলেন স্থপতি শম্ভু মিত্র, তারপর আসলেন শাঁওলি মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র, গড়ে উঠল নতুন নতুন দল- 'আরাধ্য', 'পঞ্চম বৈদিক', 'চেনামুখ'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬০ সালে ২৯শে জুন নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠি গঠন করেন। ১৯৭৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর নিজের দল ছেড়ে নতুন নাটকের দল 'নান্দীমুখ' গঠন করেন। উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার ভেঙ্গে 'পি.এল.টি. গঠন করলেন। এই ভাবে ভাঙ্গন চলছেই নাট্যজগতে। এই দৃশ্য বালুরঘাটের নাট্যজগতেও সমান ভাবে সত্য।

নাট্যমন্দিরের একশ বছরের ইতিহাসে বেশ কয়েকবার ভাঙ্গন ধরেছে। ছয়ের দশক থেকে আটের দশকের মধ্যে নাট্যমন্দির ত্রি-বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও তৎকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রী যাঁরা আজও নাট্যক্ষেত্রে রয়েছেন বা অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁদের বেশির ভাগ সদস্য কোনো সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে এখনও সত্য কথা বলার মত মানুষ রয়েছেন তাই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন হয়। নাট্যমন্দিরের প্রথম ভাঙ্গন ১৯৫৯-১৯৬০ সালে। নাট্যমন্দিরের সদস্য অবিনাশ দত্ত, সত্যরঞ্জন তালুকদার (গোবিন্দ) কানাই দত্ত নাট্যমন্দিরের গতানুগতিক নাট্য ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ 'ত্রিশূল' (১৯৫৯-১৯৬০) নাট্য সংস্থা গড়ে তোলেন ''নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যই ত্রিশূলের সৃষ্টি''[৩]।

নাট্যমন্দিরের দ্বিতীয় ভাঙ্গন ১৯৬৯ সালে। ১৯৬৯ সালে নাটককার, অভিনেতা, পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দির থেকে বেড়িয়ে গড়ে তোলেন 'ত্রিতীর্থ' নাট্য সংস্থা। ভাঙ্গনের কারণ হিসেবে অভিনেতা মিহিরবরণ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত হল-

''১. নাটকে বাধ্যতামূলক পাঠ মুখস্থ করা।
২. উৎকৃষ্ঠ নাটক মঞ্চস্থ ব্যপারে মত বিরোধ।
৩. নতুন সদস্যপদের ক্ষেত্রে মত বিরোধ।''[৪]

নাট্যমন্দিরের ভাঙ্গন সম্পর্কে কবি মুকুল বসুর মন্তব্য ''শরীর থেকে দূষিত রক্ত নিষ্কাশিত হয়ে গেলে সুস্থতা ফিরে আসার ক্লিনিক্যাল তত্ত্বটি সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। ব্যক্তি যখন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড়ো হওয়ার দাবী কার্যকরী করতে চায়, তখন এরকম হওয়াই স্বাভাবিক''।[৫]

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর নাট্যমন্দির ত্যাগ করার কারণ হিসেবে যা বলেছেন তা

বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ''১৯৬৮- এর পরে ১৯৬৯ পর্যন্ত এই প্রায় এক বছর নাট্যমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। নাট্যমন্দিরের যে স্ট্রাকচার, ওদের যে চলার প্যাটার্ন, মানে প্রতিষ্ঠানে যা থাকে সেটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না এবং আমি এ নিয়ে প্রতিবাদও করতাম। যা হোক এই কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে একটা অসুবিধা হচ্ছে। তখন সব থেকে বড় কথা তুমি জানো যে, ১৯৬৭ সালে অলরেডি যুক্তফ্রন্ট এবং তারপর ১৯৭৮তে বামফ্রন্ট, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এখানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল আর. এস.পি.। তারা চেষ্টা করে সমস্ত অর্গানাইজেশনকে কব্জায় আনতে। সেই রকম ভাবে চেষ্টা করে নাট্যমন্দিরকেও কব্জায় আনতে। This was think I had did't like এবং আমি Practically ওখান থেকে বিদায় নিই, আমি ছেড়ে দিই। কিছুদিন ওরা আমাকে সদস্য পদের জন্য বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি আর ফিরে যাইনি''।[৬]

১৯৬৯ সালের নাট্যমন্দিরের সাধারণ সভায় অভিনেতা পরিচালক দীপক রক্ষিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত সালের কমিটি গঠন কালীন অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন- ''মিটিংটা প্রথম অবস্থা থেকে নমিনাল আলোচনা, সেই আলোচনার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে এমন জায়গা হয়ে গেল যে শেষে দেখা গেল অলোচনা শেষে কমিটি গড়ার ক্ষেত্রে একটা বিতন্ডা এসে গেছে। আমরা তখন খুবই ছোট সুতরাং তখন এই আলোচনায় ঢুকে কোনো কিছু করার মত অবস্থাও নেই। অনেক কথা বুঝতেও পারছিনা কেন এমন হচ্ছে। হতে হতে দেখা গেল শেষ অবস্থায় যখন কমিটি হবে তখন একটা থম ধরা ভাব। একটা কমিটি বাছাই হচ্ছে- কেউ কেউ নিজেদের নাম উইড্রো করে নিতে বলল। তাহলে এটা হল না আবার একটা কমিটি করো। আবার কমিটি করা হল। প্রতিবার মিটিং-এর পর খাওয়াদাওয়া ব্যবস্থা থাকত। এই মিটিং যাদের মন:পূত হয়নি তাঁদের মধ্যে অনেকে না খেয়েই চলে গেলেন এবং সেই মিটিং এ সনৎদাকে সামনে রেখেই কমিটি হয়। সনৎদা সবারই বন্ধু বান্ধব যে কোনো কারণেই হোক কথা বলতে সনৎদা হঠাৎ বলে ফেললেন ' আপনারা তো ওয়াকআউট করে গেলেন আবার ভেতরে ঢুকছেন কেন যান বেড়িয়ে যান।' সনৎ এমন কথা বলে দিল- সবাই ছোট বেলার বন্ধু, তা এই একটা ব্যপারে রাগ করে কয়েকজন বেড়িয়ে গেল। যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেখানে দুলু সেন, সনৎ সেন, অমিতাভ সেন, হরিমাধব মুখার্জ্জী ছিলেন। তারা জেনেও গেল তারা আছে। কেউ কেউ খেল কেউ খেল না। একটা মান-অভিমান মত। এমন কিছুনা। এরপর তিন-চারদিন ঐ লোকগুলি আর আসে না। কোথায় বসছে, কাউকে নেওয়া না নেওয়া- এই ব্যাপার গুলি ছিল। নাটক করছি, নাটক অন্ত:প্রাণ, সে কারণে এটা ঘটছে তা নয়। এই দুলুদা যিনি এতদিন কমিটিতে ছিলেন, পূর্বেরটাতেও ছিলেন, বর্তমানেও ছিলেন তিনি চলে গেলেন। মাধব মুখার্জীকে ফেরানোর জন্য নাট্যমন্দির চেষ্টা করেছিল। তারা চেয়েছিল হরিমাধব মুখার্জী তাদের সঙ্গে থাক। শেষ দেখা যায় একমাসের মধ্যেই 'ত্রিতীর্থ' হয়ে যায়।''[৭] মেকাপম্যান সুরঞ্জন দাস (মন্টু) যিনি ছোট খাট অভিনয়ও করতেন তাঁর বক্তব্যও প্রণিধান যোগ্য। ''নাট্যমন্দিরে রাজনীতি সাংঘাতিক প্রবল ছিল। কংগ্রেস, সি.পি. এম., আর এস.পি., বিভিন্ন দলের লোক রাজনীতি শুরু করে। এই সময়টাতে নাটক অভিনয় প্রায়ই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে দলের ভোট বেশি পড়ত, সেই দল থেকেই সাধারণ সম্পাদক হত। হেরে যাওয়া মানুষগুলি নাট্যমন্দিরে থাকলেও তাদের প্রাধান্য থাকত না। অরূপ ভট্ট াচার্য্যের সময় থেকেই দলাদলি বেশি হয়েছিল। আর এস.পি. এর অধিকারে চলে যায় নাট্যমন্দির। বিভিন্ন সময়ে সদস্যদের মধ্যে নাট্যমন্দির দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব এর ফলেই নাট্যমন্দিরে

ভাঙ্গন ধরেছিল।''[৮]

নাট্যমন্দিরের তৃতীয় ভাঙ্গন ১৯৮২ সালে। প্রণব চক্রবর্তী সহ প্রায় ৩০জন সদস্য একবারে বেড়িয়ে যান। কারণ হিসেবে মিহির বরণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন- ''১. নাট্যমন্দিরকে অনেকে নিজের সম্পদ বলে মনে করত। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মত বিরোধ। ২. নাট্যমন্দিরের সম্পাদক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটে হেরে গিয়ে কিছু সদস্য নাট্যমন্দির ত্যাগ করেন।''[৯]

অভিনেতা, পরিচালক প্রণব চক্রবর্তীর কথায় '' কনটেন্ট বড় কথা, কনটেনার দিয়ে কী হয়? বিল্ডিং দিয়ে কী হয়? বিল্ডিং-এ কিছু হচ্ছে কিনা সেটাই বড় কথা। এখানে একটা প্রতিষ্ঠান, একটা জমিদার বাড়ির মত, বাড়ির দখল কে নেবে? আমরা দেখলাম, আমরা তো নাটক করতে পারব না, আমরা আমাদের মত করতে পারবো না। সুতরাং একটা ব্যতিক্রমী চিন্তা করা দরকার। নাট্যমন্দিরে একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল''[১০]

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের ভাগ্যাকাশে বার বার নেমে এসেছে বিপর্যয়। 'ত্রিশূল' (১৯৫৯-১৯৬০), 'ত্রিতীর্থ'(১৯৬৯), 'নাট্যতীর্থ'(১৯৮২) ছাড়াও অনেক সদস্য বিভিন্ন সময়ে নাট্যমন্দির থেকে নাটক অভিনয়ের শিক্ষা নিয়ে নিজেকে তৈরি করে নাট্যমন্দির ছেড়ে চলে গেছেন, গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন নাট্য সংস্থা। তাই দেখা যায় নাট্যমন্দিরের অঙ্গ থেকেই আরো নাট্যমন্দির সংস্থা গড়ে উঠেছে। তার ফলে বালুরঘাটের নাটকের জোয়ার এসেছে। ''এই বিভাজন নাটকের ক্ষেত্রে ভালো হয়েছে কেন না এত কোয়ানটিটির চাপ - তার কোয়ালিটিও ছিল- এইটা নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানে এতলোক থাকতে পারে না। অনেকদিন আগেই এটা বিভাজন হওয়া উচিত ছিল। সেটা হল। যাঁরা রাগ করে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন কেবল তাঁরাই 'ত্রিতীর্থ' গড়ে তুলেছে তা নয়। যাঁরা এই কমিটিতে ছিল বা সদস্য ছিল তাঁরা মিলিত হয়ে ত্রিতীর্থ গড়ে তোলেন। আর যাঁরা নাট্যমন্দিরে থাকল তাঁরা নাট্যমন্দিরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করল। তাতে নাটকের লাভ হল। অসংখ্য প্রযোজনা দু-পক্ষই করেছে।''[১১] তার ফলে বালুরঘাটের নাট্য আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। প্রতিটি সংস্থা নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছে। নাটকের আলোচনা সভা, ওয়ার্কশপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। এতে বালুরঘাটের নাটকের মানের উন্নতি হয়েছে। প্রতিভাবান ভালো ভালো অভিনেতা নাট্যমন্দির ছেড়ে চলে যাওয়াতে নাট্যমন্দিরের আপাত ক্ষতি হলেও নতুন নতুন সদস্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা নতুন উদ্দ্যমে, প্রতিযোগিতার মন নিয়ে নাটক করেছে এবং নাট্যমন্দির অচিরেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে।

বাংলার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের বিশেষ স্থান রয়েছে। কারণ বাংলা একাঙ্ক নাটকের জন্মস্থান হল এই 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' আর জনক হলেন নাটককার ড. মন্মথ রায়। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সুর্বণ জয়ন্তী উৎসব এবং নেহেরু পুরস্কার প্রাপ্তিতে ড. মন্মথ রায়ের সম্বর্ধনা দিবসে নাট্যতত্ত্ব মীমাংসক শ্রী সাধন ভট্টাচার্য ও নাট্য সমালোচক শ্রী অজিত ঘোষের উপস্থিতিতে নাটককার মন্মথ রায় বলেছিলেন- ''বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় কাহিনী অনুসরণে ছাত্রাবস্থায় লেখা 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটির অভিনয় রাত দশটায় আরম্ভ হয়ে পরের দিন সূর্য উঠে গেল তবু নাটকটির যবনিকা পতন হল না। শেষ দৃশ্য

অভিনয়ের সময় দেখা গেল প্রেক্ষাগারে লোক নেই ঝাড়ুদার এসে দাঁড়িয়েছে ঘর ঝাট দিতে। এই যে ঘা খেলাম তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংকল্প করলাম এবার লিখব খুব ছোট একটি নাটক যার সিনও পালটাতে হবে না আর বহু চরিত্রের ঝামেলাও নেই যাতে। আমার এই নাটকটি লিখি ১৯২৩ সালে ..... নাটকটির নাম 'মুক্তির ডাক'। নাট্য ইতিহাস রচয়িতারা বাংলার প্রথম একাঙ্ক নাটক গণ্য করে অভিনন্দিত করেছেন।''[১২]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে 'দিনাজপুর ড্রামাটিক ক্লাবে'র কিছু নাট্যানুরাগী ব্যক্তি সরকারী চাকরি নিয়ে বালুরঘাটে আসেন। এদের মধ্যে অনেকেই নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। শিবপ্রসাদ কর, তুলশী চন্দ, মনুদাশ গুপ্ত, বিমল দাশগুপ্ত, অমিয় সেন, মনি সেন, মনি মুখার্জী, শচীন দাশশর্মা। প্রত্যেকেই অভিনয় জগতে স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। অমিয় সেন নাট্য পরিচালক হিসেবে দক্ষ ছিলেন। ''১৯৫৫ -১৯৫৬ সালে নাট্যমন্দির এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেয়। 'কালিন্দী' নাটক অভিনয়ে মহিলারা নারী চরিত্রে রূপদান করেন। সে সময় ছোট শহর বালুরঘাটে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। পথিকৃত হিসেবে এই সাধুবাদ নাট্যমন্দিরের প্রাপ্য''।[১৩] মধ্যবিত্ত সংস্কার ত্যাগ করে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন গীতা চৌধুরী, সুকু চ্যাটার্জী, ও রুবি শিকদার, । পাঁচের দশকে নাট্যমন্দির দু'বার কলকাতার নামী দু একজন অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালক নিয়ে Combination Night এর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম বার রবি রায়, ভূমেন রায় এদের সঙ্গে স্থানীয় শিল্পির সমাবেশে 'কেদার রায়' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। পরবর্তীতে মহেন্দ্র গুপ্ত, মাধবী মুখার্জীর সঙ্গে স্থানীয় অভিনেতাদের মিলিত ভাবে অভিনীত হয় 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। এই দুটি নাটকের অভিনয় বালুরঘাটে সারা ফেলেছিল।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নাট্যমন্দিরের সংস্কারের জন্য ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা অনুদান দেন। সেই টাকায় তখন নাট্যমন্দিরের সীমানা প্রাচীরটি তৈরি হয়। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা দিয়েছে। ১৯৮২ সালে জেলা সমাহর্তা ও জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিকে ১১২৫০.০০(এগারো হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা অনুদান দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে বালুরঘাট পৌরসভা নাট্যমন্দিরকে ২৫০০০.০০(পঁচিশ হাজার) টাকা দেন। ২০০১ সালে সমর সরকার মহাশয় নাট্যমন্দিরের সম্পাদক হন। তিনি সরকারী সাহায্যে নাট্যমন্দিরের যে সংস্কার করিয়েছিলেন তিনি তাঁর বয়ান দিয়েছেন-''২০০৩ সালে Govt. of India B.A.D.P. থেকে শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর (মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) চেষ্টায় ২৭,০০,০০০/-(সাতাশ লক্ষ) টাকা নাট্যমন্দিরের সংস্কারের জন্য পাওয়া যায়। এই টাকা দুই দফায় দেওয়া হয়। প্রথম দফায় ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ) টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকা। মোট ২৭,০০,০০০/- টাকা পাওয়া যায়। MLA কোঠায় ১,২৩,০০০/- (এক লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা নাট্যমন্দিরের বৈদ্যুতিক সংস্কারের জন্য নাট্যমন্দিরকে দেন। প্রথম ২৭,০০,০০০/- টাকা যে ভাবে খরচ করা হয়েছে তার মোটামুটি বিবরণ। নাট্যমন্দিরের তখন একেবারে ভগ্নদশা। সংস্কারের দ্রুত প্রয়োজন ছিল। তাই পুরোনো কাঠামো ঠিক রেখে পুরোনো যা কিছু ছিল সবই নতুন করা হয়।

১। নাট্যমন্দিরের মাথায় যে টিনের চাল ছিল তাতে সম্পূর্ণ নতুন টিন লাগান হয়।
২। ভিতরের সিলিং নতুন করে করা হয়।
৩। উপরে যে কাঠের ব্যালকনি ছিল তা কংক্রিটের করা হয়।

৪। নাট্যমন্দিরের ভিতরের এবং বাইরের দেওয়ালে সম্পূর্ণ প্লাষ্টার করা হয়, ভিতর এবং বাইরে রং করা হয়।
৫। নাট্যমন্দিরের সব পুরানো ভাঙ্গা দরজা এবং জানালা পালটিয়ে সমস্ত জানালা দরজা নতুন করে করা হয়।
৬। নাট্যমন্দিরের Counter Room পাশে Store Room, Green Room এবং সম্পাদকের ঘরের পুরাতন টিন পরিবর্তন করে ছাদ দেওয়া হয়।
৭। নাট্যমন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি নতুন বারান্দা করা হয়।
৮। নাট্যমন্দিরের প্রেক্ষাগৃহের পুরাতন কাঠের চেয়ারের পরিবর্তে নতুন চেয়ার বসানো হয়।
৯। নাট্যমন্দিরের মঞ্চটি সম্পূর্ণ রূপে নতুন করে করা হয়।
১০। মঞ্চের পর্দাটি নতুন করে করা হয়।
১১। নাট্যমন্দিরের শতবর্ষ উপলক্ষে নাট্যমন্দিরের পিছনের দিকে একটি দ্বিতল শতবর্ষ ভবন তৈরি করা হয়। শতবর্ষ ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল নাট্য প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং গ্রন্থাগার তৈরি হবে এই ভাবনা মাথায় রেখে।
১২। নাট্যমন্দিরে কোন স্যানেটারী ব্যবস্থা এবং টয়লেট ছিল না। সম্পূর্ণ নতুন করে স্যানেটারী এবং টয়লেট ব্যবস্থা করা হয়। নাট্যমন্দিরের টিউব ওয়েল উঠিয়ে Running Water এর ব্যবস্থা করা হয়।
১৩। নাট্যমন্দিরের প্রেক্ষাগৃহের ভিতরের সমস্ত বৈদ্যুতিক কাজ নতুন করে করা হয়। আলো, পাখা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নতুন করে করা হয়।

B.A.D.P. থেকে যে ২৭,০০,০০০/-(সাতাশ লক্ষ) টাকা পাওয়া গিয়েছিল সেই সমস্ত টাকাটাই Superintendent Engineer,P.W.D Dakshin Dinajpur এবং জেলা সমাহর্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর এর মারফৎ নাট্যমন্দিরের উন্নয়ন খাতে খরচ করা হয়।

MLA কোঠায় যে ১,২৩,০০০/- (এক লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই বালুরঘাট Municipality, P.W.D. দপ্তর মারফৎ সমস্ত টাকাই খরচ করা হয়।

এই দুই পর্যায়ের টাকাই সরকারী দায়িত্বে খরচ হয়। সম্পাদক নিজে কোনো খরচ করেনি, কারণ সরকারী আনুকুল্যের টাকা সরকার মারফৎ খরচ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পূর্ণ কাজটি করতে ২০০৩ থেকে ২০০৮ অর্থাৎ নাট্যমন্দিরের শতবর্ষ পূর্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ চলেছিল এবং শতবর্ষে উৎসব পালনের পূর্বেই তা শেষ করা হয়েছিল।''[১৪] বালুরঘাট নাট্যমন্দির ১৯৮৭ সালে রেজিষ্ট্রেন পায়। রেজিষ্ট্রেশন নম্বর এস/৫৩৫৫৬/ নাট্যমন্দির পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধীন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

'শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির ১৯০৯-২০০৮ স্মরণিকাতে' প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৬৩টি নাটকের নাম আছে। তবে সেখানে দুটি নাটকের নাম (দেবাসুর, অমৃত অতীত) দুইবার উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও আমি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং নাট্যমন্দিরের প্রবীন অভিনেতা/সদস্যদের কাছ থেকে আরো ২০টি নাটকের নাম সংগ্রহ

করেছি, যে গুলি নাট্যমন্দিরের প্রযোজনা কিন্তু নাট্যমন্দিরের তালিকা ভুক্ত হয়নি। নাট্যমন্দিরের বিভিন্ন স্মরণিকাতে যে অভিনীত নাটকের তালিকা দেওয়া হয়েছে সেগুলি কালানুক্রমিক ভাবে নেই। নাট্যমন্দিরের প্রবীন অভিনেতা/সদস্যদের (তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত) সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এবং নাট্যমন্দিরের স্মরণিকা থেকে কোন অভিনেতা নাট্যমন্দিরের সদস্যপদ কবে নিয়েছেন তিনি কোন কোন নাটক দেখেছেন কিংবা দেখেননি তাঁদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে নাট্যমন্দিরে অভিনীত নাটক গুলির পর্ব ভাগ করেছি। নাট্যমন্দিরের তালিকাভুক্ত সমস্ত নাটকের রচয়িতার নাম ও রচনা কাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ এমন কিছু নাটক আছে সমকালীন নাটককারের শুধুমাত্র পান্ডুলিপি থেকেই অভিনয় করা হয়েছে, তার মুদ্রিত রূপ নেই। প্রবীন অভিনেতা/সদস্যের নাট্যমন্দিরের মধ্যে অনেকেই স্মৃতিভ্রষ্ট কিংবা রোগগ্রস্থ। তাই তাঁদের স্মৃতি থেকেও নাটককারের নাম, অভিনয় কাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সবথেকে দু:খের বিষয় যে 'নাট্যমন্দির' সংস্থাটি একশো বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু নাট্যমন্দিরের কোনো 'তথ্যবই' নেই। সাক্ষাৎকারে বিভিন্নজনের কাছে শুনেছি যে নাট্যমন্দিরের 'রেজ্যুইলেশন বুক' ছিল হয়ত ১৯৮৫ বন্যায় নষ্ট হয়েছে কিম্বা কোনো অসৎ ব্যক্তি 'রেজ্যুইলেশন বুক' নিয়ে আর ফেরৎ দেননি। ১৯৮৬ সালের পূর্বে কোনো লিখিত প্রমাণ নাট্যমন্দির থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি উক্ত কারণে সমস্ত নাটকের চরিত্র লিপি প্রস্তুত কারও সম্ভব হয়নি। তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় পত্র পত্রিকা ও ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর নির্ভর করতে হয়েছে বহুলাংশে। ঠিক একই কারণে নাট্যমন্দিরে অভিনীত নাটক গুলির প্রকৃতি (পঞ্চাঙ্ক কিংবা একাঙ্ক) নির্ণয় করাও সম্ভব হয়নি। নাট্যমন্দিরে অভিনীত নাটক গুলির নাটককারের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলো দিয়েছি। যে নাটক গুলির পাশে সাল দেওয়া হয়েছে, তা নাটক গুলির অভিনীত সাল। নিম্নে নাট্যমন্দিরের ১৯৪৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রযোজিত সমস্ত নাটক ও আমার গবেষণা লব্ধ ২০টি নাটক এবং সাধারণ সদস্যের তালিকা দেওয়া হল।

১৯৪৭ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অভিনীত নাটক (নাটকের পাশে উল্লেখিত সাল নাটকটির প্রযোজনা কাল)

১৯৫০-১৯৬৯

মরাহাতি লাখটাকা - ড. মন্মথ রায়
তাইতো - বিধায়ক ভট্টাচার্য
চক্রধারী
মাটির ঘর - বিধায়ক ভট্টাচার্য
সানিভিলা - প্রমথ নাথ বিশী
মানময়ী গালর্স স্কুল- রবীন্দ্রমোহন মৈত্র
কেদার রায় - রমেশ গোস্বামী
মেঘমুক্তি
সূর্যগ্রহণ
জীবনটাই নাটক - ড. মন্মথ রায়

মমতাময়ী হাসপাতাল – ড. মন্মথ রায়
গণশার বিয়ে
খনা – ড. মন্মথ রায়
উল্কা
কালিন্দী ১৯৫৬ – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আগামী দিন
রাত্রিশেষ
শুভযাত্রা
মন্ত্রশক্তি
ক্ষুধা – বিধায়ক ভট্টাচার্য
পলিন – ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
ধৃতরাষ্ট্র
সারথী শ্রীকৃষ্ণ
রূপালী চাঁদ – ধনঞ্জয় বৈরাগী
ক্ষুদিরাম
দুইপুরুষ – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বামী-স্ত্রী – শচীন সেনগুপ্ত
জন্মদিন – মোহিত চট্টোপাধ্যায়
বাংলার প্রতাপ – শচীন সেনগুপ্ত
পি.ডব্লু.ডি. – জলধর চট্টপাধ্যায়
প্রতিব্রতা – যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী
সিথির সিঁদুর – জলধর চট্টোপাধ্যায়
কংকাবতীর ঘাট
দুই মহল – জোছন দস্তিদার
ভাড়াটে চাই – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ডাউন ট্রেন – সলীল সেন
কাঞ্চন রঙ্গ – শম্ভু মিত্র ও অমিত মিত্র
প্রতিধ্বনি – শ্যামল সেনগুপ্ত
চোর – ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
চোরাবালি – কিরণ মৈত্র
দমকল
ফেরারী ফৌজ – উৎপল দত্ত
ক্যাম্প থ্রী – শৈলেশ গুহনিয়োগী
কালপুরুষ

ময়ূর মহল
টিপুসুলতান – মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত
নিশাচর
অমৃতস্য পুত্রা: – রতন কুমার ঘোষ
সেম সাইড – শৈলেশ গুহনিয়োগী
ঝর্ণা
মায়াযুগ
বিন্দুর ছেলে
শতবর্ষ আগে
মহানিশা – যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী
পঞ্চাব কেশরী – মহেন্দ্র গুপ্ত
অভিষেক
বৌদির বিয়ে – শৈলেশ গুহনিয়োগী
দত্তা – শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তটিনীর বিচার – শচীন সেনগুপ্ত
মিশর কুমারী – বরদা প্রসাদ দাসগুপ্ত
সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত
বাংলায় বোমা
উত্তরা
বভ্রুবাহন – ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
মারাঠা মোগল
মীতা
বিশ পঞ্চাশ – কিরণ মৈত্র
চাঁদসদাগর – ড. মন্মথ রায়
ধর্ষিতা – জ্যোৎস্নাময় ঘোষ
বিবাদ নিবারণী মহৌষধ
ঋনংকৃত্বা – প্রমথ নাথ বিশী
বৃষ্টি বৃষ্টি – দ্যা রেন মেকার (রির্চাড ন্যাস) – অসিত দে
অমৃত অতীত – ড. মন্মথ রায়
লৌহ প্রাচীর
ছায়ানায়িকা
চারপ্রহর – বিরু মুখোপাধ্যায়
ছেঁড়াতার–১৯৬৯ – তুলসী লাহিড়ী
ফেরা – রতন ঘোষ

১৯৭০-২০০৮

সকালের জন্য ১৯৭০ – রতন ঘোষ
কালোমাটির কান্না-১৯৭০
ঝুমুর – ১৯৭১ – শৈলেশ গুহনিয়োগী
সেই মেয়ে- ১৯৭১
তাহার নামটি রঞ্জনা- ১৯৭১ – বিধায়ক ভট্টাচার্য
সোনার হরিণ
লৌহ কপাট- ১৯৭২ – জরাসন্ধ
অন্য ছায়া- ১৯৭২ – কিরণ মিত্র
এরা কারা
সমুদ্র সন্ধানে
আবর্জনা
সিগারেট পাকানোর কৌটা – ব্রজ সুন্দর দাস
পাপপূণ্য – অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় (রূপান্তরিত)
গণদেবতা
ভাবীকাল
সাহিত্যিক – বিরু মুখোপাধ্যায়
যা তারা পারেনি – কিরণ মিত্র
আমার মাটি
ঈশ্বর বাবু আসছেন
শয়তান শ্রী ১৯৭৩ – ড. মন্মথ রায়
নয়ন কবীরের পালা
নীল দর্পন ১৯৭৩ – দিনবন্ধু মিত্র
অরুণোদয়ের পথে-১৯৭৩ – (লেডি গ্রেগরির 'রাইজিং অফ দ্যা মুন') রূপান্তর
পথের দাবী – ১৯৭৬ – অমলেশ মিত্র (নাট্য রূপ)
মারীচ সংবাদ-১৯৭৬ – অরুণ মুখোপাধ্যায়
ফাঁস-১৯৭৭
সূর্য শিকার ১৯৭৭ – উৎপল দত্ত
অগ্নিগর্ভ-হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি-১৯৭৭ – শ্যামলতনু দাস
জুলিয়াস ফুচিক-১৯৮০
দানসাগর-১৯৭৯/১৯৮০
সাজানো বাগান-১৯৮০
কালাবদর-১৯৮১

প্রস্তুতি-১৯৮৩
যৌবন-১৯৮১
গুলশান-১৯৮২
রাজদর্শন-১৯৮৩
বাঘিনী-১৯৮৬
খেলওয়ালা-১৯৮৮
তীর্থযাত্রী-১৯৮৮
শাস্তি-১৯৯০
দর্পন সাক্ষী-১৯৯৩
প্রদোষে প্রভাত
ভূ-ভারহরণ কর্পোরেশন-১৯৯৯
কেউ কথা রাখে না ২০০৪
দায়বদ্ধ-২০০৮

নাট্যমন্দিরের প্রযোজনা কিন্তু 'শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির ১৯০৯-২০০৮ স্মরণিকা'তে যে নাটক গুলির নাম উল্লিখিত হয়নি তা নিম্নে দেওয়া হল-

শেষ রক্ষা
ধাত্রীপান্না - শচীন সেনগুপ্ত
কাবুলিওয়ালা - অমলেশ মিত্র
টিনের তলোয়ার - উৎপল দত্ত
পথভ্রষ্ট
মীরকাশিম - ড. মন্মথ রায়
নটীবিনোদিনী - চিত্তরঞ্জন দাস
যবনিকা কম্পমান
লালন - অমলেশ মিত্র
জীবন দর্পন
কোথায় গেল
নিকটে ফাঁদ
গৃহপ্রবেশ
নিস্কৃতি - অমলেশ মিত্র
পোষ্টমাস্টার - অমলেশ মিত্র
নরনারায়ণ-ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
কৈবর্ত বিদ্রোহ

শ্রীমধুসূদন – বনফুল
বিদ্যাসাগর – বনফুল
সর্পযজ্ঞ –

১৯০৯ থেকে সাধারণ সম্পাদক বৃন্দের নাম

শ্রী রাধাচরণ ভট্টাচার্য
শ্রী প্রতাপ চন্দ্র গুপ্ত
শ্রী ললিত চন্দ্র দত্ত
শ্রী মন্মথ রায়
শ্রী সুরেন্দ্র নাথ সিংহ
শ্রী নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী জীবু রায়
শ্রী জীতেন্দ্র নাথ সমাজদার
শ্রী সনৎ কুমার সেন
শ্রী অচিন্ত্য কৃষ্ণগোস্বামী
শ্রী গিরীশ সাহা
শ্রী প্রণব চক্রবর্তী
শ্রী কান্তি চক্রবর্তী
শ্রী অরূপ ভট্টাচার্য
শ্রী মানিক লাহিড়ী
শ্রী শরৎ সাহা
শ্রী চিত্ত মহান্ত
শ্রী অমলেশ মিত্র
শ্রী সমর সরকার

১৯১১ সালের কার্য্যকরী সমিতি

অনারারী সেক্রেটারী–	শ্রী রাধাচরণ ভট্টাচার্য
সহকারী অনারারী সেক্রেটারী–	শ্রী উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি–	শ্রী নলিনী কান্ত অধিকারী
ম্যানেজার–	শ্রী শশাঙ্ক শেখর রায়
স্টেজ ম্যানেজার–	শ্রী চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়
সহকারী স্টেজ ম্যানেজার–	শ্রী বিভূতি ভূষণ সান্যাল
বিজনেস ম্যানেজার–	শ্রী ব্রজেন্দ্র বসু

১৯১১ সালে কার্য্যকরী সমিতির পর থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কোনো কার্য্যকরী সমিতির উল্লেখ নেই। ১৯৬৩ সাল থেকে কার্য্যকরি সমিতির সদস্যদের নাম দেওয়া হল–

১৪-০৫-১৯৬৩

১। শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ
২। প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়
৩। কমলেশ চক্রবর্তী – সহ সভাপতি
৪। শ্রী অর্দ্ধেন্দু সরকার
৫। অধীর কুমার বিশ্বাস
৬। শ্রী উৎপলেন্দু রায়
৭। শ্রী প্রভাস সমাজদার – সহ অধ্যক্ষ
৮। সনৎ সেন – সাধারণ সম্পাদক
৯। শ্রী জীতেন্দ্র নাথ সমাজদার
১০। শ্রী যতীন্দ্র নাথ ভৌমিক – সহ সম্পাদক
১১। নিরঞ্জন বিশ্বাস – অধ্যক্ষ
১২। শ্রী সুনির্মল সরকার – অন্ত: নিরীক্ষক
১৩। শ্রী স্বপ্ন কুমার গুহ রায় – সহ সভাপতি
১৪। স্মৃতিশ চন্দ্র গুপ্ত ভায়া

১১-০৫-১৯৬৫

১।কমলেন্দু চক্রবর্তী–সহ সভাপতি
২। ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ
৩। ভবেশ সরকার
৪। চিররঞ্জন সাহা
৫। প্রণব মুখার্জ্জী–সহ সম্পাদক
৬। স্বপ্ন গুহ রায়–সহ সভাপতি
৭। নগেন্দ্র নাথ তরফদার–অন্ত: নিরীক্ষক
৮। সনৎ সেন–সাধারণ সম্পাদক
৯। অমিতাভ সেন–অধ্যক্ষ
১০। সুনির্মল সরকার
১১। স্মৃতিশ গুপ্ত ভায়া
১২। উৎপলেন্দু রায়
১৩। বীরেন্দ্র নাথ খাঁ–সহ অধ্যক্ষ
১৪। শান্তিরঞ্জন গুহ।

১৪-০৬-১৯৬৭

১। অধীর কুমার বিশ্বাস-অন্ত: নিরীক্ষক
২। অরূপ ভট্টাচার্য
৩। অমলেশ মিত্র-সহ সম্পাদক
৪। চিররঞ্জন সাহা
৫। ধীরেন ঘোষ -সহ সভাপতি
৬। অমিতাভ সেনগুপ্ত-অধ্যক্ষ
৭। অরুণ কুমার দাস
৮। উৎপলেন্দু রায়- সহ অধ্যক্ষ
৯। কানাই চট্টোপাধ্যায়
১০। নিরঞ্জন বিশ্বাস
১১। প্রভাস সমাজদার
১২। শান্তিরঞ্জন গুহ
১৩। সুনির্মল সরকার
১৪। সনৎ সেন-সাধারণ সম্পাদক

১১-০৫-১৯৬৯

১। সনৎ সেন-সাধারণ সম্পাদক
২। অচিন্ত্য গোস্বামী
৩। চিররঞ্জন সাহা -সহ সভাপতি
৪। অপূর্ব চৌধুরী
৫। মধুসূদন সাহা
৬। বিনয় রায় - স্টক পরীক্ষক
৭। ভবেশ ব্যানার্জ্জী -কার্য্যকরী সভাপতি
৮। অমিতাভ সেনগুপ্ত
৯। অরূপ ভট্টাচার্য
১০। মানিক লাহিড়ী-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১১। বীরেন খাঁ
১২। বিশ্বনাথ চৌধুরী
১৩। হরিমাধব মুখার্জী
১৪। গৌতম চৌধুরী- প্রসাশনিক সম্পাদক
১৫। ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ

২৯-০৫-১৯৭১

১। চিত্তরঞ্জন দত্ত-স্টক পরীক্ষক
২। ভবেশ ব্যানার্জ্জী- কার্য্যকরী সভাপতি
৩। বীরেন্দ্র নাথ খাঁ
৪। প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়- সাংস্কৃতিক সম্পাদক
৫। নিরঞ্জন বিশ্বাস
৬। উৎপলেন্দু রায়
৭। অরূপ ভট্টাচার্য
৮। কমল সরকার- প্রসাশনিক সম্পাদক
৯। শরৎ সাহা
১০। প্রণব কুমার চক্রবর্তী
১১।চিররঞ্জন সাহা-সহসভাপতি
১২। শ্রীমতি রেণুকা রায়
১৩। শ্রী প্রবোধ তলাপাত্র
১৪। অপূর্ব শঙ্কর চৌধুরী
১৫। অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী-সাধারণ সম্পাদক

৩১-০৫-১৯৭৫

১। ভবেশ ব্যানার্জী-কার্য্যকরী সভাপতি
২। মানিক লাহিড়ী
৩। অরূপ ভট্টাচার্য - সাংস্কৃতিক সম্পাদক
৪। প্রণব কুমার চক্রবর্তী
৫। সরোজ সাহা-স্টক পরীক্ষক
৬। কমল সরকার- প্রসাশনিক সম্পাদক
৭। প্রণব চক্রবর্তী
৮। অমলেশ মিত্র
৯। কান্তি চক্রবর্তী-সহ সভাপতি
১০। অচিন্ত্য গোস্বামী-সাধারণ সম্পাদক
১১। মনিমোহন গুহ বক্সী
১২।আশিষ রায়
১৩। শ্যামল সরকার
১৪। বিনয় রায়
১৫। দ্বিজপদ সাহা

১৩-০৫-১৯৭৭

১। আশিষ বসু
২। অচিন্ত্য গোস্বামী-সাধারণ সম্পাদক
৩। স্বপন নিয়োগী
৪। সুখেন্দু চৌধুরী
৫। মনিমোহন গুহ বক্সী
৬। অপূর্ব চৌধুরী
৭।ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়- কার্য্যকরী সভাপতি
৮।কান্তি চক্রবর্তী-সহসভাপতি
৯। উৎপলেন্দু রায়
১০। অরূপ ভট্টাচার্য-স্টক পরীক্ষ
১১।অমলেশ মিত্র - সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১২। সরোজ সাহা- প্রসাশনিক সম্পাদক
১৩। পরিতোষ দাস
১৪।সমর সরকার
১৫। মিহির বরণ মুখোপাধ্যায়

১৭-০৬-১৯৭৮

১। ভবেশ ব্যানার্জী- কার্য্যকরী সভাপতি
২। অচিন্ত্য গোস্বামী
৩।কান্তি চক্রবর্তী - সহ সভাপতি
৪। প্রণব চক্রবর্তী -সাধারণ সম্পাদক
৫।অরূপ ভট্টাচার্য
৬।চিত্ত দত্ত
৭। সমর সরকার
৮।মনিমোহন গুহ বক্সী
৯। আশিষ রায়- স্টক পরীক্ষক
১০। মিহির বরণ মুখোপাধ্যায়
১১। উৎপলেন্দু রায়
১২। প্রদ্যুৎ কুমার রক্ষিত
১৩। শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র- সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১৪। সুখেন্দু চৌধুরী
১৫। পরিতোষ দাস - প্রসাশনিক সম্পাদক

১৭-০৫-১৯৮০ (৮০-৮১/৮১-৮২)

১। ভবেশ ব্যানার্জী- কার্য্যকরী সভাপতি
২। কান্তি চক্রবর্তী
৩। অপূর্ব শঙ্কর চৌধুরী
৪।অরূপ ভট্টাচার্য
৫।উৎপলেন্দু রায়-সহ সভাপতি
৬। কমল সরকার
৭।পবিত্র দে
৮।মিহিরবরণ মুখার্জী
৯। প্রণব চক্রবর্তী- সাধারণ সম্পাদক
১০। পরিতোষ দাস
১১। আশিষ রায় -স্টক পরীক্ষক
১২।প্রদ্যুৎ রক্ষিত- প্রসাশনিক সম্পাদক
১৩।শুভেন্দু চৌধুরী
১৪। মনিমোহন গুহ বক্সী
১৫। শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র- সাংস্কৃতিক সম্পাদক

২৯-০৫-১৯৮২

১। মানিক লাহিড়ী-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২। সরোজ সাহা-
৩। অমলেশ মিত্র
৪। সমর সরকার
৫। চিত্ররঞ্জন দত্ত
৬। প্রণব কুমার মুখার্জী
৭। কান্তি চক্রবর্ত্তী -সাধারণ সম্পাদক
৮। দ্বিজপদ সাহা
৯। গিরিশ সাহা
১০। অরুপ ভট্টাচার্য- প্রশাসনিক সম্পাদক
১১। কল্যান কুমার চ্যাটার্জ্জী
১২। ভবেশ ব্যানার্জ্জী-কার্যকরী সভাপতি
১৩। শ্যামল সরকার
১৪। বীরেন খাঁ- সহ সভাপতি

১৫। প্রণব চক্রবর্তী(পুনু) -স্টক পরীক্ষক

৩১-০৫-১৯৮৪ (৮৪-৮৫/৮৫-৮৬)

১। ভবেশ ব্যানার্জী- কার্যকরী সভাপতি
২। কান্তি চক্রবর্ত্তী - সহ সভাপতি
৩। সরোজ সাহা- প্রশাসনিক সম্পাদক
৪। মানিক চন্দ্র লাহিড়ী
৫। অরূপ ভট্টাচার্য - সাধারণ সম্পাদক
৬। সমর সরকার
৭। গিরিশ সাহা
৮। কল্যান চ্যাটার্জী
৯। অমর দত্ত
১০। প্রণব কুমার চক্রবর্তী (পুনু)- স্টক পরীক্ষক
১১। চিত্ত মহন্ত
১২। দীপঙ্কর ব্যানার্জ্জী
১৩। সাধন মজুমদার-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১৪। অজিত মহন্ত
১৫। অচিন্ত কৃষ্ণ গোস্বামী

(৩০-০৫-১৯৮৫ সাধারণ সভায় কার্যকরী কমিটী হয়নি)

১৮-০৬-১৯৮৬ (৮৬-৮৭)

১। ভবেশ ব্যনার্জ্জী -কার্যকরী সভাপতি
২। সরোজ সাহা
৩। মানিক লাহিড়ী -সাধারণ সম্পাদক
৪। সাধন মজুমদার
৫। অরূপ ভট্টাচার্য
৬।রেবা ব্যানার্জ্জী
৭। সমর সরকার
৮। অজিত মহন্ত - স্টক পরীক্ষক
৯। সত্যেন দাস
১০। মিহির দাস- সাধারণ সম্পাদক
১১। অরুণ সেন

১২।চিত্ত মহন্ত – প্রশাসনিক সম্পাদক
১৩। প্রণব মুখার্জ্জী – সহ সভাপতি
১৪।শুভেন্দু তরফদার
১৫। অমল দত্ত

৩০-০৫-১৯৮৭ (৮৭-৮৯)

১। ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় – সভাপতি
২। কান্তি চক্রবর্ত্তী –সহ সভাপতি
৩। প্রণব মুখার্জ্জী
৪।মানিক চন্দ্র লাহিড়ী–সাধারণ সম্পাদক
৫। চিত্ত রঞ্জন মহন্ত – কোষাধ্যক্ষ
৬।মিহির দাস– সহ সম্পাদক
৭।রেবা ব্যানার্জ্জী
৮। সরোজ সাহা
৯। সাধন মজুমদার
১০। সমর সরকার
১১। অরূপ ভট্টাচার্য
১২। দীপঙ্কর ব্যানার্জ্জী
১৩। অজিত মহন্ত
১৪। আশিষ বসু
১৫। প্রণব কুমার চক্রবর্তী

২৯-০৫-১৯৮৯ (৮৯-৯১)

১। ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় –কার্যকরী সভাপতি
২। কান্তি চক্রবর্তী
৩। চিত্তরঞ্জন মহন্ত
৪। মানিক চন্দ্র লাহিড়ী
৫। মিহির দাস
৬। সরোজ সাহা – সাধারণ সম্পাদক
৭।প্রণব কুমার চক্রবর্তী
৮। সাধন মজুমদার
৯। সমর সরকার
১০। অজিত মহন্ত – সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১১। দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১২। সুপ্রিয় রায়
১৩। গিরিশ সাহা
১৪। সত্যেন দাস
১৫। অরূপ ভট্টাচার্য
১৬। রেবা ব্যানার্জী
১৭। কল্যান চট্টোপাধ্যায়
১৮। কাঞ্চন সাহা
১৯। প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়
২০। মিহির বরণ মুখোপাধ্যায়
২১।শীতল চক্রবর্তী

২৪-০৬-১৯৯১

১। ভবেশ ব্যানার্জী- কার্য্যকরী সভাপতি
২। সরোজ সাহা - সহ সভাপতি
৩। চিত্ত মহন্ত -সাধারণ সম্পাদক
৪। সমর সরকার
৫। অরূপ ভট্টাচার্য
৬।প্রণব চক্রবর্তী -আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক
৭। কাঞ্চন সাহা
৮। মিহির মুখার্জী - প্রশাসনিক সম্পাদক
৯। দেবু দে
১০। শীতল চক্রবর্তী
১১। সাধন মজুমদার -সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১১। গিরিশ সাহা
১২। সুপ্রিয় মজুমদার

০৪-০৭-১৯৯৪

১। অরূপ রঞ্জন ভট্টাচায
২। শীতল চক্রবর্তী
৩। সরোজ সাহা - সহ সভাপতি
৪। গিরিশ সাহা
৫। প্রণব কুমার চক্রবর্তী
৬। সাধন মজুমদার - সাংস্কৃতিক সম্পাদক
৭।সমর সরকার
৮। দেবু দে

৯। পরিতোষ রায়
১০। মিহিরবরণ মুখার্জ্জী
১১। অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী
১২। চিত্তরঞ্জন দত্ত
১৩। চিত্তরঞ্জন মহন্ত – সাধারণ সম্পাদক

৩০-০৫-১৯৯৫

১। অরূপ ভট্টাচার্য
২। শীতল কান্ত চক্রবর্তী
৩। চিত্তরঞ্জন মহন্ত
৪। সাধন মজুমদার – সাংস্কৃতিক সম্পাদক
৫। গিরিশ সাহা – সহ সভাপতি
৬। সমর সরকার – সহসভাপতি
৭। সত্যেন দাস – প্রশাসনিক সম্পাদক
৮।দেবু দে
৯। মিহির দাস
১০। মুকুট মজুমদার
১১।স্বপন সান্যাল
১২।মিলন দাস
১৩। স্বপন দাস
১৪। শ্রীমতি সন্ধ্যা কর্মকার

০৪-০৬-১৯৯৭

১। অরূপ রঞ্জন ভট্টাচার্য
২। চিত্তরঞ্জন মহন্ত – সাধারণ সম্পাদক
৩। সমর সরকার– সহ সম্পাদক
৪। স্বপন সান্যাল
৫। স্বপন সরকার – সংস্কৃতিক সম্পাদক
৬। সাধন মজুমদার – সহ সভাপতি
৭। অজিত মহন্ত
৮। সত্যেন দাস– প্রশাসনিক সম্পাদক
৯। কাঞ্চন সাহা
১০। অমলেশ মিত্র
১১। শ্রীমতি সন্ধ্যা কর্মকার

১২-০৭-১৯৯৯

১। সমর সরকার–কার্য্যকরী সভাপতি

২। সাধন মজুমদার- সহ সভাপতি
৩। চিত্তরঞ্জন মহন্ত-সহ সভাপতি
৪। অমলেশ মিত্র - সাধারণ সম্পাদক

৫। অজিত মহন্ত-প্রশাসনিক সম্পাদক

৬। স্বপন সরকার-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

৭। স্বপন দাস-কোষাধ্যক্ষ

৮। মিলন দাস- ষ্টক পরীক্ষক

৯। সরোজ সাহা

১০। কাঞ্চন সাহা

১১। সত্যেন দাস

১২। গিরীশ সাহা

১৩। স্বপন কুমার সান্যাল

০৩/০৬/২০০১ (সন্ধ্যা ৭-৩০)

১। সমর সরকার - সাধারণ সম্পাদক

২। চিত্ত মহন্ত-সহ সভাপতি

৩। স্বপন সান্যাল

৪। স্বপন সরকার

৫। স্বপন দাস - সাংস্কৃতিক সম্পাদক

৬। মিলন দাস

৭। কাঞ্চন সাহা

৮। গিরীশ সাহা

৯। সত্যেন দাস

১০। সাধন মজুমদার - কার্যকরী সভাপতি

১১। অজিত মহন্ত - প্রশাসনিক সম্পাদক

১২। ইন্দ্রনীল দাস

১৩। অমলেশ মিত্র –সহ সভাপতি

৩০-০৭-২০০৩ (সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট)

১। অমলেশ মিত্র – সহ সভাপতি

২। সমর সরকার – সাধারণ সম্পাদক

৩। চিত্তরঞ্জন মহন্ত – সহ সভাপতি

৪। সাধন মজুমদার– কার্য্যকরী সভাপতি

৫। মানিক চন্দ্র লাহিড়ী

৬। স্বপন কুমার সান্যাল

৭। স্বপন কুমার দাস

৮। স্বপন কুমার সরকার

৯।মিলন দাস

১০। সত্যেন দাস

১১। মিহির দাস

১২। ইন্দ্রনীল দাস

১৩। অজিত মহন্ত

১৪। কাঞ্চন সাহা

১৫। সরোজ সাহা

১৬। অরুণ সেন

১৭। গিরীশ সাহা

৩১-০৭-২০০৫ (সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট)

১। চিত্তরঞ্জন মহন্ত – কার্যকরী সভাপতি

২। গিরীশ নারায়ণ সাহা – সহ সভাপতি

৩। সমর কুমার সরকার – সাধারণ সম্পাদক

৪। সাধন মজুমদার – প্রশানিক সম্পাদক

৫। অঞ্জন লস্কর – সাংস্কৃতিক সম্পাদক

৬। মিহির দাস – সহসভাপতি

৭। সত্যেন দাস

৮। স্বপন কুমার দাস

৯। ইন্দ্রনীল দাস

১০। সন্তোষ সাহা

১১। অরুণ সেন

২৯-০৭-২০০৭ (সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট)

১। সরোজ সাহা – কার্য্যকরী সভাপতি

২। গিরীশ সাহা – সহ-সভাপতি

৩। অমলেশ মিত্র – সহ-সভাপতি

৪। সমর সরকার – সাধারণ সম্পাদক

৫। সাধন মজুমদার – প্রশাসনিক সম্পাদক

৬। ইন্দ্রনীল দাস – সংস্কৃতিক সম্পাদক

৭। মিহির দাস

৮। অঞ্জন লস্কর

৯। স্বপন সান্যাল

১০। অজিত মহন্ত

১১। সন্তোষ সাহা

১২। স্বপন সরকার

১৩। মিলন দাস

১৪। অরুণ সেন

১৫। সত্যেন দাস

স্বাধীনতা পরবতীকালের সাধারণ সদস্যদের তালিকা

১৯৪৮

অমিয় সেন

অবনী তলাপাত্র

অনিল সেন চৌধুরী

বিনয় ভূষণ পাঠক

ব্যোমকেশ দত্ত

বিভূতি ভূষণ পাল

বিনয় পাল

ভবানী ভট্টাচার্য

চিত্ত বসু

ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী

দানী ভদ্র

ফনীন্দ্র নাথ ভদ্র

ফনীন্দ্র নাথ পাঠক

গৌরী প্রসাদ ঘোষ

হীরালাল চন্দ

হরিদাস বাগচী

যতীন গুপ্ত

জীতেন্দ্র সরকার

কালীতোষ ভট্টাচার্য

লক্ষ্মীনারায়ণ পাল

মনীন্দ্র মুখার্জী

মদন ধর

মনীন্দ্র নাথ গুপ্ত

মনীন্দ্র নাথ ভদ্র

নির্মলেন্দু সান্যাল

নির্মাল্য ব্যানার্জী

নগেন তরফদার

নির্মল দাসগুপ্ত

নীরোদ গোবিন্দ চৌধুরী

নরেন্দ্র খাঁ

নির্মলেন্দু চন্দ

পবিত্র শিব রায়

প্রকাশ সরকার

পুষ্প ভট্টাচার্য

রমানাথ বোস

রণেন্দ্র নাথ সরকার

স্বপ্ন গুহ রায়

শ্রীশ মুখার্জী

সাধন ভট্টাচার্য

ষষ্টি সেন

সমীর মুন্সী

সন্তোষ কুমার দাস

শরৎ সেন

উমেশ রায়

১৯৪৯

অমরেশ রায়

বিমল গোবিন্দ বিশ্বাস

যোগেন সোম

প্রবোধ তলাপাত্র

শান্তি রায়

সুরেশ ব্যানার্জী

১৯৫০

তুলসী দে

সৌরিণ ব্যানার্জী

অধীর চক্রবর্ত্তী

দেব কুমার ঘোষ

করুণা সান্যাল

মানু দাসগুপ্ত

নিখিলেশ্বর সরকার

ননী গোপাল সরকার

পুলক নিয়োগী

রণজিৎ বোস

রমেন্দ্র কর

১৯৫১

বিভূতি দাস

নগেন্দ্র নাথ মিত্র

রমনী ঠাকুর

সুধীন্দ্র খাঁ

তারাপদ খাঁ

১৯৫২

অনিল রায়

অবিনাশ দত্ত

বিপিন মন্ডল

বিশ্বজিৎ বাগচী

বিভুতি ভূষণ দাস

বিমল দাসগুপ্ত

জ্যোতি নন্দী

কালিদাস সেন

নালু পাল

প্রণব কুমার দাস

শান্তি খাঁ

শিশির দাশগুপ্ত

১৯৫৩

অজিত চক্রবর্ত্তী

কানাই দত্ত

কান্তি চক্রবর্ত্তী

রঘুনন্দন শীল

সুনির্মল সরকার

শ্রীশ চন্দ্র দাস

১৯৫৪

অজিত কুমার গুপ্ত

আশিস মুখার্জী

জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জী

যতীন ভৌমিক

মলয় চক্রবর্ত্তী

মিহির দাসগুপ্ত

নিরঞ্জন বিশ্বাস

নীলরতন শিকদার

শিবপদ খাঁ

শিবু সরকার

সনৎ সেন

সত্যরঞ্জন তালুকদার

শিশির রঞ্জন রায়

শৈলেশ নন্দী

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌরীন মজুমদার

উৎপলেন্দু রায়

১৯৫৫

অবনী চক্রবর্ত্তি

অরুণ কুমার দাস

অমরেন্দ্র সিংহ

বীরেশ্বর সরকার

প্রভাস সমাজদার

বিমল পন্ডিত

ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ

দিলীপ রায়

জাতাদীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

মিহির বরণ মুখোপাধ্যায়

মহারাজা বসু

মানস সেন

নির্মলেন্দু রায়

নিতাই ঘোষ

প্রবোধ কুমার ঘোষ

পীযুষকান্তি ঘোষ চৌধুরী

১৯৫৬

অমিতাভ সেন

অজিত গোবিন্দ সিদ্ধান্ত

চিররঞ্জন সাহা

ঝন্টু তরফদার

নির্ম্মল রায়

পূর্ণেন্দু নন্দী

পল্টন কর্ম্মকার

সুদন ভট্টাচার্য

শীতল চক্রবর্ত্তী

শচীন দাস

সুভাষ সান্যাল

১৯৫৭

অধীর বিশ্বাস

অধীর চক্রবর্ত্তি

অর্দ্ধেন্দু সরকার

ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য

হেরম্ব চ্যাটার্জী

মানবেন্দ্র চ্যাটার্জী

ননীগোপাল দাসচৌধুরী

প্রতুল কুমার দাসগুপ্ত

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

শচীন দাসগুপ্ত

স্মৃতিশ গুপ্তভায়া

শিবনাথ সরকার

১৯৫৮

প্রতুল জোয়ারদার

১৯৫৯

অমিয় চ্যাটার্জী

অমরেন্দ্র নারায়ণ চ্যাটার্জী

বিমল ভট্টাচার্য

পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শচীন দাস শর্ম্মা

১৯৬১

দ্বিজপদ সাহা

১৯৬২

অমূল্য রতন দাস

গোপীনাথ দাস

জগন্নাথ চ্যাটার্জী

মহেন্দ্র দাস

পুলীন বিহারী দাসগুপ্ত

প্রণব কুমার মুখার্জী

সুধীর কুমার বোস

সুশীল সরকার

সম্বল বাগচী

১৯৬৩

ভবেশ সরকার

চিত্তরঞ্জন দত্ত

লোকেশ মৈত্র মজুমদার

প্রভাত নন্দী

স্বদেশ ভৌমিক

১৯৬৫

অমলেশ চন্দ্র মিত্র

হরিনারায়ণ গুপ্ত

সুধীর দে

১৯৬৬

অরূপ রঞ্জন ভট্টাচার্য

আশিস বসু

১৯৬৭

দীপঙ্কর ব্যানার্জ্জী

অপূর্ব্ব শঙ্কর চৌধুরী

অসীম প্রসাদ রায়

আশিস দত্তগুপ্ত

ব্রজবল্লভ সাহা

বিনয় কান্তি চক্রবর্ত্তী

বিনয় ভূষণ রায়

বিশ্বনাথ চৌধুরী

বীরেন মজুমদার

বীরেন দত্ত

গিরীশ সাহা

গোকুল সাহা

হরিমাধব মুখার্জী

কালিকা প্রসাদ মজুমদার

কমলকৃষ্ণ সরকার

মধুসূদন সাহা

মনীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

মানিক লাহিড়ী

পবিত্র দে

প্রশান্ত মজুমদার

সনৎ রায় চৌধুরী

সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী

সূর্য্য কুমার চক্রবর্ত্তী

সরোজ কুমার সাহা

সুনীল বসু

সাধন কুমার দাস

সন্তোষ দাস

১৯৬৮

অমরেন্দ্র নাথ দত্ত

গৌতম চৌধুরী

নিহার ভট্টাচার্য

নির্মলেন্দু তালুকদার

প্রদ্যুৎ কুমার রক্ষিত

পূজণ সেনগুপ্ত

১৯৬৯

অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী

অরুণ রায়

অসিত রায়

অনিল ঘোষ

অমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

অখিল সাহা

অপর্ণা লাহিড়ী

বিমল মজুমদার

অরুণ সরকার

বিজন দাস

বিমল দাস

দেবকুমার গুহ

চিররঞ্জন ব্যানার্জী

ধীরেন মহান্ত

দেবরঞ্জন ভট্টাচার্য

গণেশ সরকার

গৌরী শঙ্কর অধিকারী

গোপাল শর্মা

জগদীশ মন্ডল

কানু চন্দ্র দাস

কালীপ্রসাদ কর

ক্ষিতি ভূষণ গোস্বামী

মরণ সাহা

মনিমোহন সিংহ

মনোজিত রায়

মীরা মজুমদার

নিতাই সাহা

নিমাই সাহা

নির্মল সরকার

নারায়ণ ঘোষ

প্রণব কুমার চক্রবর্ত্তী

পরিতোষ দাস

প্রশান্ত দে

প্রভাত সরকার

রেণুকা রায়

রণজিত কুমার চাকি

সুকুমার কর

শিশির বিশ্বাস

সমর সরকার

সুমিত তালুকদার

সন্তোষ সাহা

সুবল লাহিড়ী

শান্তি রঞ্জন গুহ

স্বপন নিয়োগী

সুভাষ বসু

তড়িৎ খাঁ ভাদুড়ী

তাপস গোস্বামী

তুলসী প্রসাদ

১৯৭০

আশিস কুমার রায়

কানু চ্যাটার্জী

কল্যাণ চ্যাটার্জী

পুরুষোত্তম সোমানী

পরিতোষ সান্যাল

প্রণব চক্রবর্ত্তী

১৯৭১

অশোক মুখার্জী

বিপ্লবেন্দু রায়

বামদেব রায়

চিত্তরঞ্জন মহান্ত

গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী

প্রদোষ মিত্র

রণজিৎ কুমার দত্ত

সুনীল বরণ মুখার্জী

শ্যামল সরকার

সুবোধ চ্যাটার্জী

প্রদীপ চৌধুরী

প্রদীপ বাগচী

১৯৭২

শিব প্রসাদ চক্রবর্ত্তী

১৯৭৭

সুখেন্দু চৌধুরী

সত্যেন দাস

শ্যামা প্রসাদ তলাপাত্র

অঞ্জন গুহ

অজিত মহন্ত

শুভজ্যোতি রায়

সজল কান্তি চক্রবর্ত্তী

অঞ্জনলাল লস্কর

বিকাশ চৌধুরী

শান্তি গোপাল রায়

তুষার দেব

বোধিসত্ত্ব মজুমদার

দেবু দে

সুব্রত মজুমদার

১৯৭৮

শ্রী শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী

সুনীল খাঁ

১৯৮০

শ্যামল চ্যাটার্জী

সুনীল বক্সী

অরুণ দত্ত

১৯৮১

শুভেন্দু তরফদার

দেবব্রত চক্রবর্ত্তী

প্রণব কুমার চক্রবর্ত্তী

অজয় সাহা

১৯৮২

গোপীনাথ দাস

নির্মল কুমার সরকার

সুব্রত মজুমদার

রেবা ব্যানার্জী

নমিতা মিত্র

অঞ্জুশ্রী দাস

রুমা নন্দী

সঞ্চিতা রায়গুপ্ত

বীথিকা মুখার্জী

সাধন মজুমদার

অমরেন্দ্র নাথ দত্ত

১৯৮৪

সুপ্রীয় মজুমদার

অনুপম অধিকারী

কাঞ্চন সাহা

সুকুমার কর্মকার

মিহির দাস

সন্তোষ মাতা

ননীগোপাল বণিক

সজল সরকার

অমূল্য দাস

১৯৯০

শ্রী পরিতোষ রায়

১৯৯৪

শংকর দত্ত

স্বপন সান্যাল

স্বপন সরকার

স্বপন দাস

মিলন কুমার দাস

সুরজিত দত্ত

বিকাশ রায় চৌধুরী

সুদর্শন গোস্বামী

সুশান্ত সাহা

শ্যামল সাহা

রঞ্জন সরকার

সন্ধ্যা কর্মকার

২০০০

দিলীপ সাহা

ইন্দ্রনীল দাস

সমীর চক্রবর্ত্তী

মানস চক্রবর্ত্তী

২০০৭

চন্দন সাহা

নিতাই সাহা

আশিস সাহা

শান্তনু গোস্বামী

জনার্দন কর্মকার

অনিল মুখার্জী -

কিছু নাটকের চরিত্র লিপি ও নাট্যসমালোচনা দেওয়া হল

নাটক-ফেরা

নাটককার-রতন ঘোষ
পরিচালক- সনৎ সেন
সময় - ১৯৬৯
আলো-পুরুষোত্তম সোমানী

চরিত্র লিপি

ঋত্বিক - সনৎ সেন
শর্বরী -রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক - প্রণব মুখার্জী
দার্শনিক - অরূপ ভট্টাচার্য
মহাকাল - নিমু রায়

নাটক-তাহার নামটি রঞ্জনা

নাটককার -বিধায়ক ভট্টাচার্য
পরিচালক -সনৎ সেন
সময়- ১৯৭১

চরিত্র লিপি

কৌশিক - সনৎ সেন
রঞ্জনা - রেবা মুখার্জী
পন্ডিত - অরূপ ভট্টচার্য
পুলিশ - গোপীনাথ দাস
জেলার -প্রণব মুখার্জী

নাটক-ঝুমুর

নাটককার - বিধায়ক ভট্টাচার্য
পরিচালক - বীরেন খাঁ
সময় - ১৯৭১
আবহ সঙ্গীত - প্রণব মুখোপাধ্যায়

চরিত্র লিপি

মদন - গিরিশ সাহা
ফটিক - অমলেশ মিত্র
রাধাবালা - মালবিকা খাঁ
রাধাবালার বাবা - আশিষ রায়

চরণ দাস – নিরঞ্জন বিশ্বাস
বৃদ্ধ – তুলসী চন্দ
মূল গায়েন – প্রণব মুখোপাধ্যায়
বাজিকর – দেবল রায়
বিড়িওয়ালা (প্রচারের নর্তকী) – রণজিৎ কুমার চাকী
হারমনিয়াম বাদক(বিড়ির প্রচারের) – বীরেন খাঁ
এছাড়াও মেলার অনেক লোক –

নাটক-নীলদর্পন

নাটককার – দীনবন্ধু মিত্র
সময় –১৯৭৩
মঞ্চরূপায়ন –মনীমোহন গুহ বক্সী
আলোক – সমর সরকার
সহযোগী –নিমাই সাহা
–রঞ্জিত চাকী

চরিত্র লিপি

গোলক বসু –ভবেশ বন্ধ্যোপাধ্যায়
সাধু চরণ –সরোজ সাহা
রাইচরণ –অমলেশ মিত্র
নবীন মাধব –অরূপ ভট্টাচার্য
বিন্দু মাধব –প্রণব চক্রবর্তী
উড্ সাহেব –মিহির মুখোপাধ্যায়
রোগ সাহেব –উৎপলেন্দু রায়
তোরাপ –মানিক লাহিড়ী
আমিন –আশিষ লাহিড়ী
গোপিনাথ –প্রণব মুখোপাধ্যায়
দারোগা –শ্যামল সরকার
রায়ত –অনিল মুখোপাধ্যায়
–দ্বিজপদ সাহা
–চিত্ত মহন্ত
লাঠিয়াল – বীরেন্দ্র নাথ খাঁ
পেয়াদা – গোপীনাথ দাস
চারণ দল – প্রণব কুমার চক্রবর্তী
– অশোক মুখোপাধ্যায়
– ননীগোপাল দাস
– বীরেন্দ্র নাথ খাঁ
– দেবেন্দ্র নট্ট ও সম্প্রদায়
সাবিত্রী – শ্রীমতি শান্তি ভট্টাচার্য
ক্ষেত্র মণি – শ্রীমতি অর্চনা বিশ্বাস

পদী ময়রানী – শ্রীমতি মঞ্জু দত্ত

নাটক-অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি

নাটককার – শ্যামলতনু দাসগুপ্ত
পরিচালক – অরূপ ভট্টাচার্য
সময় – ১৯৭৭
মোট অভিনয় রজনী-৩৭

চরিত্র লিপি:

মতিশা – সুখেন্দু চৌধুরী
সামসের – শুভোজ্যোতি রায়
নায়েব – আশিষ রায়
মুকুন্দ সর্দার – সত্যেন দাস
পরাণ – গৌরীশঙ্কর
বৃন্দাবন – অজিত মহন্ত

'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের গেরস্তি' নাটকটি বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। কোলকাতা, কাটিহার, মালদা, শিলিগুড়িতে অভিনীত হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ ড্রামা প্রতিযোগিতা মালদা-১৯৭৭' প্রতিযোগিতায় 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরানমন্ডলের ঘর গেরস্তি' একাঙ্ক নাটকটি পুরস্কৃত হয়।

১. Best Performance
২. Best Director – অরূপ ভট্টচার্য
৩. Best Actor –সুখেন্দু চৌধুরী
৪. Best Second Actor –আশিষ রায়

'শিলিগুড়ি যুব উৎসব পশ্চিমবঙ্গ সরকার' ১৯৮৩ আমন্ত্রিত হয়ে গেছে।

নাটক-সাজানো বাগান

নাটককার – মনোজ মিত্র
নির্দেশনা – প্রদ্যুৎ রক্ষিত ও অরূপ ভট্টাচার্য
সময় – ১৯৮০
আলো – বোধিসত্ব মজুমদার
আবহ সংগীত – প্রণব চক্রবর্তী
মঞ্চ – অজিত মহন্ত, স্বপন নিয়োগী, তোতন দাস, চন্দন সেন, জার্মান মাহালী, অজয় সাহা।
রূপসজ্জা – মন্টু অধিকারী

চরিত্র:

বাঞ্ছা কাপালী	- শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
গুপী	- শুভজ্যোতি রায়
ছ'কড়ি	- শ্যামল চ্যাটার্জী
নকড়ি	- দেবল রায়
মোক্তার	- আশিষ রায়
হোঁৎকা কোঁৎকা	- সুব্রত মজুমদার
চোর	-অজিত মহন্ত
গনৎকার	- অজয় সাহা
পুরোহিত	-অসিত রায়
গোবিন্দ ডাক্তার	- সত্যেন দাস
একজন গ্রামবাসী	- স্বপন নিয়োগী
শববাহক যুবকেরা	- মনিমোহন গুহবক্সী, জার্মান মাহালী, বাবু সরকার, চন্দন সেন
পদ্ম	-অঞ্জুশ্রী দাস
ন'কড়ির স্ত্রী	-রীণা কর্মকার।

''দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা, আবহসঙ্গীত ও আলো যথোপযুক্ত। নাটকের দুটি দৃশ্যকে আলো ও অন্ধকারের মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত করে প্রয়োজনীয় দৃশ্যে মঞ্চের অর্ধাংশ আলোকিত করবার পরিকল্পনা পরিচালকের সুপরিকল্পনারই সুন্দর নিদর্শন। শেষ দৃশ্যে বাঞ্ছার আশা আকাঙ্খার কথা তার নিজের গলায় টেপের মাধ্যমে প্রচার পরিকল্পনা প্রসংশার দাবিই রাখে। অশরীরি জমিদারের রূপসজ্জা সহ আলোর ব্যবহার ও গা ছম্ ছম্ পরিবেশ সৃষ্টি আবদ্য। ..... পক্ষর রূপসজ্জা দৃষ্টি কটু হলেও তার ভালো অভিনয়ে চরিত্রের চটুলতা ও ব্যক্তিত্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার অভিনয় ক্ষমতায় ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা করবার আছে। বাঞ্ছার অভিনয় এই নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার রূপসজ্জা, কণ্ঠস্বর, চলাফেরা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি জাত অভিনেতার ছাপ রেখেছেন। নকুর দত্ত ও তার মোক্তার সু-অভিনয় করেছেন। গুপি সুন্দর ছেলেমি ও পরিণত দুটি পর্যায়ে গুপির অভিনয় ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে চোর, গনৎকার, ডাক্তার ও পুরোহিতের অভিনয় যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রয়াত জমিদারের অভিনয়ও প্রশংসার দাবি রাখেন''।[১৫]

<u>নাটক -দানসাগর:-</u>

নাটককার	- দেবাশীষ মজুমদার
পরিচালক	- দীপক রক্ষিত
সময়	- ১৯৮০
আলো	- নিমাই দে
অভিনয় রজনী	- ২৫ রজনী।

<u>চরিত্র লিপি:-</u>

ঘিসু	- শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
মাধোর বৌ	-

মাধো – আশিস রায়
নিতাই – দেবব্রত চক্রবর্তী
গণেশ – স্বপন নিয়োগী
কত্তাবাবু – দেবল রায়
নোনা রায় – অজয় সাহা
চোর – সুখেন্দু চৌধুরী
নবকৃষ্ণ – প্রণব চক্রবর্তী
চৌকিদার – অসিত রায়

মুন্সি প্রেমচাঁদের 'কফন্' গল্পের নাট্যরূপ 'দানসাগর'। ছোট গল্পের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে অনেক কিছুই বাড়াতে হয়েছে। কিছু সংযোজন খাপ খেয়েছে আবার কোথাও মনে হয়েছে আরোপিত। ''ঘিসু যখন মুখ হাঁ করে বিশ্বরূপ দর্শন করায় বা মাধোকে শিবের ভূমিকা নেবার জন্য উত্তেজিত করে তখন চরিত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক মনে হয় না। এসব সত্ত্বেও বলব দানসাগর এক সাহসী প্রযোজনা। পরিচ্ছন্ন পরিচালনার জন্য নাট্যমন্দিরের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি দেখে মানসিক অস্বস্তিতে পড়তে হয়নি কখনও। অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয়েছে দু একটি কথা। যেমন ঘিসুর ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্রের অভিনয়। সংলাপে এবং রূপ সজ্জায় পীড়ন ও দারিদ্রের পরিচয় রয়েছে কিন্তু ঘিসুর চোখের চাহনীতে তীব্র ক্ষোভ ধরা পড়েনি। অস্থির চঞ্চল চোখ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয় পীড়ণজনিত ক্ষোভ তাঁর অন্তরের বিষয় নয়। ..... অর্থনৈতিক শোষণ, সমাজের ঘৃণা তার চরিত্রে এক ধরণের অস্তিত্ববাদী ঔদাসীন্য নিয়ে এসেছে; তার সব কিছু বলা কওয়ার অন্তরালে এই ক্ষোভ এবং সমাজের প্রতি তির্যক মনোভঙ্গী ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ঘিসু চরিত্রে এই ধারালো দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সে তুলনায় মাধোর ভূমিকা আশিস রায় সকল অভিনয় করেছেন। এক পেশে চরিত্রে বিশ্লেষণের জটিলতা নেই সে কথা ঠিক তবু এই ভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রে সহমর্মিতা গড়ে তোলা সহজ নয়। দেবল রায়ের কত্তাবাবু এক কথায় পরিচ্ছন্ন এবং পরিমিত। ..... ঘিসুর কুটীর খানায় খরের ছাউনি আর দরমার বেড়া – কিন্তু সবকিছুই নতুন ঝক্ ঝকে – এটা কিন্তু বেনান। জীর্ণতার ছাপ ঘর দুয়ারে থাকা চাই; সেখানেই তো চোখ পড়ে আগে। নাটকের করুণ মুহূর্ত গুলিতে রাগ-সঙ্গীতের ব্যবহার 'কফন'-এর পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবহ সঙ্গীত হিসেবে বিহার অঞ্চলের লোক সঙ্গীতের সুর এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত''।[১৬]

নাটক-কালাবদর

নাটককার – শ্যামল সেনগুপ্ত
নির্দেশনা –পরিতোষ দাস
সময় – ১৯৮১
আলো – বোধিস্বত্ব মজুমদার
আবহ সংগীত – প্রণব চক্রবর্তী
রূপসজ্জা – মন্টু অধিকারী
মঞ্চ – স্বপন নিয়োগী, সুখেন্দু চৌধুরী, তোতন দাস, চন্দন সেন, জার্মান মাহালী, সুব্রত মজুমদার, অজয় সাহা।

চরিত্র:

ভূষণ	- দেবল রায়
সাধুচরণ	- জীবেশ দাস
নিমাই	- শামাপ্রসাদ তলাপাত্র
পুটু	- প্রদ্যুৎ রক্ষিত
ইন্দ্র	- পরিতোষ দাস
সহদেব কুন্ডু	- দেবব্রত চক্রবর্তী
দত্তবাবু	- শ্যামল চ্যাটার্জী
আগন্তুক	- শুভেন্দু তরফদার
ক্যাম্পবাসীগণ	- মনিমোহন গুহবক্সী, বাবু সরকার, অজিত মহান্ত, তোতন দাস, অমর দত্ত, পবিত্র দে, অজয় সাহা, সত্যেন দাস, সুখেন্দু চৌধুরী, জার্মান মাহালী, অসিত রায়।
দুর্গা	- রুমা নন্দী

১৯৮২ সালের বালুরঘাট নাট্যমন্দির ৫ই মার্চ থেকে ৭ই মার্চ কলকাতার শিশির মঞ্চে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করছিল। প্রয়োজনায়, পরিচালনায় এবং সমবেত অভিনয়ের গুণে তিনটি নাটকই দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে' নাটক তিনটির নাম-'সাজানো বাগান' (মনোজ মিত্র), 'জুলিয়াস ফুচিক', (চিররঞ্জন দাস), ও 'কালাবদর' (শ্যামল সেনগুপ্ত)। প্রথম দুটি নাটক কলকাতার মঞ্চে কলকাতার নাট্যসংস্থা গুলির দ্বারা বহু অভিনীত ও বহু প্রদর্শিত। কিন্তু একমাত্র 'কালাবদর' নাটকটিই কলকাতায় কোনো সংস্থা প্রযোজনা করেননি।

''৭ই মার্চ কালাবদর। নাট্যকার শ্যামল সেনগুপ্ত। সম্ভবত নাট্যকারের এটি কলকাতায় প্রথম অভিনীত নাটক। নাটক ও প্রযোজনা খুবই বলিষ্ঠ। নাট্যোৎসবে এই নাটকটির প্রযোজনা সর্বশ্রেষ্ঠ বললে বোধহয় ভুল হবে না। বক্তব্যে, অভিনয়ে, প্রয়োগে, আলো-মঞ্চে-আবহসঙ্গীতে নাটকটি সামগ্রিক ভাবে রসোতীর্ণ। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই ভালো অভিনয় করেছে। কলকাতার মঞ্চে নাটকটির নিয়মিত অভিনয় চলতে পারে''।[১৭]

''ব্যক্তিগত চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে রুমা নন্দীর 'দুর্গা', অঙ্কন, রূপায়ন, বিচলন, আচরণ, উন্মোচনের পর্যায়গুলিতে অঙ্কের হিসেবের মতন কাজ করেও চরিত্রটিকে নিয়ে গেছেন উত্তরীণের স্বর্গের দিকে। তিনি যেমন সপ্রাণ, তেমনি সংঘবদ্ধতায়, কম্পোজিশন এবং পিকচারাইজেশনে নির্দেশকের সবচাইতে নির্ভরশীল খুটির মতন কাজ করেছেন। এখন পর্যন্ত আমায় যদি কেউ বলেন, এই সময়কালে এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টা কে? আমি রুমার নামই বলবো। রুমা নন্দী। এ শিল্পীর কান সজাগ, কণ্ঠ শ্রুতিমধুর, শরীরে স্পর্শ সচেতনাবোধ তুঙ্গস্থ না হলে এমন অভিনয় সম্ভব হয় না''।[১৮] কলকাতার বর্জকণ্ঠ নাট্যসংস্থার কর্ণধার শ্রী কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য ''বালুরঘাট নাট্যমন্দিরকে নাট্য আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকার জন্য প্রসংশারপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন''।[১৯] ''বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের অন্যতম মহিলা শিল্পী রুমা নন্দী ১৯৮১ সালের জন্য শ্রেষ্টা অভিনেত্রী (অপেশাদার) হিসেবে সি. সি. আই. পুরষ্কার পাচ্ছেন। শ্রীমতি নন্দী 'কালাবদর' নাটকে দূর্গার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এই পুরষ্কার পান। নাটকটির পরিচালক শ্রী পরিতোষ দাস। উত্তরবঙ্গের সর্ব্বপ্রথম একজন অপেশাদার শিল্পী এই পুরষ্কার পেলেন''।[২০]

নাটক-জুলিয়াস ফুচিক

নাটককার – চিররঞ্জন দাস
পরিচালক – দীপক রক্ষিত
সময় –১৯৮১
আলো – বোধিসত্ব মজুমদার
রূপসজ্জা – মন্টু অধিকারী
আবহসংগীত – প্রণব চক্রবর্তী

চরিত্রলিপি

ফুচিক – দীপক রক্ষিত
পেসেক – পরিতোষ দাস
জেলসুপার সাপ্পা – দেবল রায়
কালিনস্কি – শুভজ্যোতি রায়
কমিশনার –সুনীল বক্সী
মিরেক – শ্যামা প্রসাদ তলাপাত্র
ড. ঝেনেকস্টাইখ – শুভেন্দু তরফদার
এস.এস. রক্ষীদ্বয় – শ্যামল চ্যাটার্জী, অমর দত্ত
অগাস্তিনা ফুচিক – রুমা নন্দী

'' 'জুলিয়াস ফুচিক' নাট্যমন্দিরের একটি নীট প্রডাকশন এবং এতে ক্লারিটি আছে। সেট ডিজাইন বেশ সুচিন্তিত। আসবাব পত্রে প্রাচীন ছাপ রাখলে ভলো হতো। কালো সেট ও জেল গেটের সাজেশন, ভালো লাগে। বিশেষ করে নাটকের শুরুটা সুন্দর।

সঙ্গীত কনভেনশনাল। একই মিউজিক বারবার এসেছে। কিছু ভ্যারাইটি আনতে পারলে ভালো হতো। তবে মিউজিকের কনট্রোল বেশ ভাল বলতে হবে। আলোর প্রয়োগ ভালোই। তবে ফ্লাড-লাইটের ব্যবহারে সংযত হওয়া দরকার ছিল। এতে জেলখানার আলো আঁধারী পরিবেশটা নষ্ট হয়েছে।..... অভিনয়ে ফুচিকের চরিত্রে দীপক রক্ষিত চরিত্রের দাবী মেটাতে পারেননি। .....কমিশা চরিত্রে সুনীল বক্সী ভাল অভিনয় করেছেন। ..... জেলের ওয়ার্ডেনের চরিত্রে বাপ্পা রায়কে মনে হয়েছে, ঐ তরুণ অভিনেতা চরিত্রটিকে সঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। ..... মীরেকের চরিত্রে শ্যামা তলাপাত্র পুরোপুরি ব্যর্থ। .....পেসেকের চরিত্রে পরিতোষ দাস ভাল অভিনয় করেছেন।''[২১]

নাটক-গুলশন

নাটককার – শ্যামাকান্ত দাস
পরিচালক – অরূপ ভট্টাচার্য / সাধন মজুমদার
সময় – ১৯৮২
আলোক সজ্জা – সমর সরকার, ননীগোপাল বনিক, মলয় বল।
মঞ্চ – অমর দত্ত
আবহ সঙ্গীত – মুকুট মজুমদার, প্রণব মুখোপাধ্যায়
অভিনীত রজনী – ১৮

চরিত্র লিপি:-

সরকার	–	প্রণব মুখার্জী
ভূতনাথ	–	সাধন মজুমদার
নারু	–	শুভজ্যোতি দত্ত
১ম মস্তান	–	সুব্রত মজুমদার
২য় মস্তান	–	অজিত মহন্ত
৩য় মস্তান	–	শুভেন্দু তরফদার
অবিদ্যা ব্রহ্মচারী	–	রঞ্জিত দত্ত
নায়লা	–	জোনাকী লাহিড়ী
গিন্নী	–	সঞ্জিতা রায়গুপ্তা

শ্যামাকান্ত দাস রচিত 'গুলশন' নাটকটি সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক। কিন্তু নাট্যমন্দির নাটকটি নিছক একটি হাসির প্রেমের নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ করেছে। নাটকটি বহু আলোচিত। ''নাট্যকারের মূল বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে পরিচালক প্রথমার্ধে দর্শকদের যথেষ্ট হাসিয়েছেন - দ্বিতীয়ার্ধে ভাবাবেগেও মেলোড্রামার আধিক্য দর্শকদের ক্লান্ত করেছে। ..... এই নাটকের শ্রেষ্ট সম্পদ সরকার মহাশয়ের চরিত্রে শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়। তিনি দর্শকদের হাসিয়েছেন - আনন্দ দিয়েছেন। বিশেষ করে টেবিল থেকে লায়লার ব্যাগ হাতে নিয়ে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের গানের সুরে 'আহা আমি কি দেখিলাম' অনবদ্য-দীর্ঘদিন মনে থাকবে। ..... নায়ক ভূতনাথের চরিত্রে শ্রী সাধন মজুমদারের অভিনয়ে প্রেম-ভাবাবেগ মেলোড্রামা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। তার অভিনয়ে ভাবুক-প্রেমিক বাঙালীর ছাপ বেশি করে পাওয়া যায়। দর্শকের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া শ্রী মজুমদারের স্বগতোক্তি আন্তরিকতার অভাবে এক ঘেঁয়েমী লাগে। কিন্তু রোমান্টিক দৃশ্যে লায়লার পায়ে আলতা লাগানো অথবা ঘোমটা টেনে দেওয়া দৃশ্যে শ্রী মজুমদার সার্থক। লায়লার ভূমিকায় জোনাকী-লাহিড়ী নাটকের চাহিদা পূরণ করেছেন। তবে অভিনয়ের আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে উঠতে পারলে আরও ভালো হতো।.....পরিচালক মা কালীর দয়ায় আলতার বদলে টেবিলে লাল কালির দোয়াত পেলেন, কালীর ছবির সামনে শালপাতায় সিঁদুর পেলেন অথচ লায়লাকে পরাবার জন্য একটা শাড়ী পেলেন না? তিনি নায়িকার হাতে তুলেদিলেন লুঙ্গি অথচ পরিয়ে আনলেন শাড়ী। বড়ই দৃষ্টি কটু।''[২২] 'গুলশন' নাটকের ১৮তম রজনীতে দর্শক হিসেবে নাট্যব্যক্তিত্ব শুভ জোয়াদারের অভিজ্ঞতা ''সস্তা কমার্শিয়াল নাটকের সেন্টিমেন্টোল সংলাপ ও অতি নাটকীয়তাকে কাটছাঁট করে নির্দেশক হয়ত প্রযোজনাটিকে একটু মানানসই বা পাতে দেবার মত করে নিতে পারতেন। কিন্তু তার জন্য যে নিখুঁত পরিমিতি বোধের দরকার, তা এই নাটকে অনুপস্থিত ছিল।.....জাত-পাত বিরোধী একটি সময় সচেতন নাটক দেখতে বসে আমরা পেলাম একটি মোটাদাগের হাসির ব্যক্তি প্রেমের নাটক। এ দায়িত্ব যাঁর উপরে ছিল, সেই নির্দ্দেশক অরূপ ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম্মে আমি পরিচিত নই। তবু এ কথা বলতে বাধা নেই যে গোটা ব্যাপারটিতেই তার অনেক সংযমী, কুশলী হওয়া প্রয়োজন ছিল।''[২৩] ''অভিনয়ে এমন সম্পূর্ণ টিম ওয়ার্ক অনেকদিন দেখিনি। এক কথায় নাটক পরিবেশন স্বার্থক হয়েছে।''[২৪] শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনীতে 'গুলশন' নাটকের অভিনয় হয় ১৭.০৭.১৯৮৩। 'গুলশন' নাটকের অভিনয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া - ''নাটক ও মঞ্চায়নের উপাদান-সম্পর্কে যত্নবান হলেই নাটক যে সর্বসাধনের উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে তার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বালুরঘাটের নাট্যমন্দির। .....নাটকের গল্পে এমন একটা সার্বজনীন আবেদন আছে

যাতে নাটকটি সব শ্রেণীর দর্শকেই আকর্ষণ করে। এই নাটকটিকে যে সংস্থাগুলি মঞ্চস্থ করতে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' তাদের মধ্যে অন্যতম।''[২৫] বিপ্লব তালুকদারের নাট্য সমালোচনার বিরুদ্ধে শুভ্রাগুপ্ত বলেছেন'' ''..... নাটকটি দেখার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লববাবু কোন চোখে নাটকটিকে সুন্দর দেখলেন বোঝা গেলনা। কারণ নাটকের উপস্থাপনায় তার বক্তব্য হারিয়ে গেছে। প্রথমত এটি মোটেই প্রেমের নাটক নয়। কিন্তু 'লায়লা'র সঙ্গে 'ভূতনাথের যতটা অন্তরঙ্গতা (বিশেষ করে গায়ে হাত দেওয়া) দেখানো হয়েছে তা দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাছাড়া পাড়ায় যে দাঙ্গা চলছে তার জন্য ভূতনাথের মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ..... এছাড়া আর অনেক ত্রুটি - বিচ্যুতি এই নাটকে বর্তমান। একমাত্র সরকার বাবুর অভিনয় ছাড়া আর সব কিছুই চোখ এবং মনকে পীড়া দিয়েছে।''[২৬] শুভ্রা গুপ্তের চিঠির উত্তরে মধুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, ''গুলশন 'প্রেমের' নাটক না হলেও 'অপ্রেমের' নাটক নয়। প্রেম এখানে কোন বিশেষ মানব মানবীতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্ত মানবজাতিতে ছড়িয়ে গেছে। তার চরম প্রমাণ পাওয়া যায় লায়লার শেষ স্বীকারোক্তিতে। আর সেজন্যই সহজ সরল ভূতনাথ অত সময় ধরে লায়লার সঙ্গে থাকার দরুণ অন্তরঙ্গ হয়ে গায়ে হাত দিয়েছে।''[২৭]

নাটক-বাঘিনী

লেখক	-	সমরেশ বসুর 'বাঘিনী' উপন্যাসের নাট্যরূপ
নাট্যরূপ	-	জয়ন্ত ভট্টাচার্য
পরিচালক	-	সাধন মজুমদার
সময়	-	১৬ই অক্টোবর ১৯৮৬ সন্ধ্যা ৬.৩০ মি:
আলোকসজ্জা	-	নিমাই দে
মঞ্চ পরিকল্পনা	-	সাধন মজুমদার
আবহ সঙ্গীত	-মুকুট মজুমদার	

চরিত্র লিপি:-

সুরেশ	-	মানিক লাহিড়ী
অখিল	-	অপূর্ব কুমার মন্ডল
কাশেম	-	প্রণব চক্রবর্তী
ভোলা	-	অজিত মহন্ত
কেষ্ট	-	রাধেশ্যাম দত্ত
ও.সি	-	শুভেন্দু তরফদার
বলাই সান্যাল	-	মানিক চক্রবর্তী
অক্রুর দে	-	স্বপন নন্দ
বাঁকা বাগ্‌দী	-	বীরেন খাঁ।
বেদো	-	সত্যেন দাস
গুলি	-	কাঞ্চন সাহা
নন্দ	-	মৃদুল মজুমদার
হীরালাল	-	খোকন কর্মকার
চিরঞ্জীব	-	সাধন মজুমদার

পরেশ – শিবপ্রসাদ মন্ডল
বুধাই – মিহির বরণ মুখার্জী
শ্রীধর দা – সরোজ সাহা
দুর্গা – রুমা নন্দী / সন্ধ্যা সাহা
যমুনা – সন্ধ্যা কর্মকার
অচলা – অঞ্জুশ্রী দাস / সবিতা দাস

মোট আট রজনী অভিনীত হয়েছিল নাটকটি। ১৯৮৬ সালে 'বাঘিনী' নাটক প্রযোজনার জন্য 'শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা' হিসাবে 'দিশারী' পুরস্কার পায়।

নাটক-খেলওয়ালা

নাটককার – সুনীল রায়
পরিচালক – সাধন মজুমদার
সময় – ২০/০৪/১৯৮৮
আলোকসজ্জা – নিমাই দে

চরিত্র লিপি:-

মাদারী – সাধন মজুমদার
ছেলেটি – রাধেশ্যাম দত্ত
মোট তিন রজনী অভিনীত হয় নাটকটি

নাটক-তীর্থযাত্রী

নাটককার – সমরেশ মজুমদার
পরিচালক – শ্রী গিরীশ নারায়ণ সাহা
আলোক সজ্জা – নিমাই দে
মঞ্চ পরিকল্পনা – শ্রী গিরীশ নারায়ণ সাহা
আবহ সঙ্গীত – মুকুট মজুমদার, মানিক লাহিড়ী
মেক আপ – মন্টু অধিকারী

চরিত্রলিপি:-

মাইক –অজিত মহান্ত / পরিতোষ রায়
পার্থ – দিলীপ সাহা
অ্যান – শ্রীমতি সন্ধ্যা সাহা

১০ রজনী নাটকটি অভিনীত হয়। ৩১/১২/১৯৮৮ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত সারা ভারতে পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ করে।

নাটক-দর্পন সাক্ষী

নাটককার – চন্দন সেন
পরিচালনা – সাধন মজুমদার
সময় – ১৯৯৩, ১৮ই ডিসেম্বর

মঞ্চ – চিত্তরঞ্জন মহান্ত
আলো – নিমাই দে
আবহ সঙ্গীত – শ্রী শ্যামল দাস
অভিনয় রজনী – ৭

চরিত্র লিপি:-

হারু – অজিত মহান্ত
জগন্নাথ – সত্যেন দাস
বিমলেশ রায় – সাধন মজুমদার
মি: সান্যাল – দীপন চন্দ
বনি – বিভাস রায়
সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী – স্বপন নন্দ
বর – কাঞ্চন সাহা
পামু – সুদর্শন গোস্বামী
নীলিমা – অনিমা দত্ত
কস্তুরী – সবিতা দাস

নাটক-প্রদোষে প্রভাত

নাট্যরূপ – অমলেশ মিত্র (নারু মিত্র)
পরিচালক – অমলেশ মিত্র
সময় – ১৯৯৫
অভিনয় রঞ্জনী – ৭

চরিত্র লিপি:-

শশীবাবু – অমলেশ মিত্র
হারাণ – মানস চক্রবর্তী
চেরকুটু – মিলন দাস
ভাটু – স্বপন সানাল
মহিম – স্বপন সরকার
বালাই – শ্যামল সাহা
মঙ্গল – সুদর্শন গোস্বামী
টিক্কা – কাঞ্চন সাহা
ওঝা – সত্যেন দাস
ফুলমনি – সন্ধ্যা কর্মকার
যুবক – ইন্দ্রনীল দাস

নাটক-শাস্তি

কাহিনি – রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর
নাট্যরূপ – বীরু মুখোপাধ্যায়

পরিচালক – গিরীশ সাহা
সময় – ০৬/০১/১৯৯০
আলো – সমীর চক্রবর্তী
আবহসঙ্গীত – মুকুট মজুমদার
অভিনয় রজনী – ৯

চরিত্রলিপি:-

দুখীরাম – গিরীশ সাহা
ছিদাম – শুভজ্যোতি রায়
রামলোচন – সত্যেন দাস
দারোগা – স্বপন নন্দ
পুলিশ – ১. তুষার দেব, ২. অজিত মহন্ত
লাঠিয়াল – দুলাল সূত্রধর
বড়বৌ – শ্রীমতি সন্ধ্যা কর্মকার
চন্দরা – সবিতা দাস
সহচরিত্রে – সৈকত সাহা, নিলাদ্রী দাস, চন্দন সেন, গোপীনাথ দাস।

নাটক-ভূ-ভার হরণ কর্পোরেশন

নাটককার – ড. মন্মথ রায়
পরিচালক – সাধন মজুমদার
সময় – ১৯৯৯ ১৬ই জুন
অভিনয় রজনী – প্রয়াত মন্মথ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে এক রাত্রি অভিনীত রায়।

চরিত্র লিপি:-

হর্ষানন্দ – স্বপন সরকার
কেবলা – অজিত মহন্ত

নাটক-মারীচ সংবাদ

নাটককার – অরুণ মুখোপাধ্যায়

'মারীচ সংবাদ' নাটকটি ১৯৭৬ সালে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম পরিচালক ছিলেন অরূপ ভট্টাচার্য। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন দীপক রক্ষিত, নারুদাস, সুখেন্দু চৌধুরী, আশীষ কুমার রায় প্রমুখ' ১৯৮২ সাল পর্যন্ত নাটকটি মোট কুড়ি রজনী অভিনীত হয়েছে। নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। দার্জিলিঙের সংযুক্তি। নাট্যসংস্থার ব্যবস্থাপনায় ১৯৮১ -এর ২২শে আগষ্ট রবীন্দ্র ভানু সদনে বালুরঘাট নাট্যমন্দির প্রযোজনা করে 'মারীচ সংবাদ'। ''মারীচ সংবাদ এ শহরের দর্শকদের মন দীর্ঘকাল ভরিয়ে রাখবে। দলগত অভিনয় নৈপুন্য এ নাটকের চাবিকাঠি। প্রত্যেক চরিত্রাভিনেতাই অসাধারণ অভিনয়ের সাক্ষর রেখেছেন। সাধারণ দর্শক তাই ঈশ্বর লেঠেলের মত ইচ্ছা মৃত্যুর বিরোধীতা করবার কথা চিন্তা করে নিজেদের অজ্ঞাতেই। অভিনন্দন জানাই এ নাটকের পরিচালক অরূপ ভট্টাচার্য ও এবং অমলেশ মিত্রকে।''[২৮] ''ওস্তাদের চরিত্রে উৎপলেন্দু রায় সত্যিকার জাদুকরকেও হারমানাবার মতই দৃষ্টি কাড়িয়া লাইয়াছেন। বস্তুত: তিনিই এই নাটকের সূত্রধরও বটে । .....নাটকের কোনো কাহিনী নাই; চরিত্র নাই। অথচ পথে প্রান্তরে ভানুমতীর খেল রূপ যাদু দেখাইতে

গিয়া অকল্পনীয় সব প্রেতাত্মাদের সমাবেশ ঘটাইয়া তাহাদের জীবৎকালের ঘনটাবলীর অভিনয় দেখানো এবং মৃত্যুর পরে অভিনয় দেখানো। জীবদ্দশায় স্ববিরোধিতা ও মৃত্যুর পরবর্তীকালের আবেগমথিত অনুশোচনায়ই এই নাটকের মূল উপজীব্য। বিদেহী এই সব বিদীর্ণ ব্যক্তিসত্তার অন্তরঙ্গ পরিচয় লক্ষ্য করা যায় রামায়ণের মারিচ চরিত্রে শুভজ্যোতি রায়ের নিপুন অভিব্যক্তিতে, রাবণ চরিত্রে শ্যামল চ্যাটার্জীর রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ গরিমায়, কালনেমির চরিত্রে সত্যেন দাসের কূটিল উল্লাসে উৎসাহে, এবং বাল্মীকির চরিত্রে ডিরেক্টর অরূপ ভট্টাচার্যের রামায়ণের পোয়েটিক জাস্টিস প্রতিষ্ঠায়।''[২৯] ২০০২ সাল থেকে নতুন চরিত্রলিপীতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট সাত রজনী অভিনীত হয়েছে। নাটকটির নতুন চরিত্রলিপি দেওয়াগেল।

পরিচালক	–	সাধন মজুমদার
আলো	–	নিমাই সাহা
আবহ সংগীত	–	রতন সরকার (হারমনিয়মে)
		সুকুমার ঘোষ (বংশীবাদক)
		সন্টু নট্ট (তবলাবাদক)

চরিত্রলিপি:-

ওস্তাদ	–	সাধন মজুদার
কালনেমী	–	সত্যেন দাস
মারীচ	–	ইন্দ্রনীল দাস
ঈশ্বর	–	স্বপন সরকার
নায়েব	–	উৎপল দাস
গ্রেগরী	–	মিলন দাস
ম্যাকি	–	স্বপন সান্যাল
রাবণ	–	আশিষ সাহা
পালবাবু	–	পবিত্র মুখার্জী
উইলিয়াম	–	দিলীপ সাহা
বাল্মীকি	–	অমলেশ মিত্র
গায়েন	–	১. চন্দন সাহা, ২. সৌমেন সমাজদার, ৩. কাজল দাস
সাকরেদ	–	কাঞ্চন সাহা
পোষ্টার বাহক	–	সুব্রত ঘোষ, সমীর চক্রবর্তী
নেপথ্যে বিষাণ	–	অজিত মহন্ত

নাটক-কেউ কথা রাখে না

কাহিনী	–	নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
নাট্যরূপ	–	অমলেশ মিত্র
সময়	–	২০০৪, ১৭ই জানুয়ারী
পরিচালক	–	অমলেশ মিত্র, সাধন মজুমদার
আলোক সজ্জা	–	নিমাই দে
অভিনয় রজনী	–	৭

চরিত্রলিপি:-

হরিহর	-	শ্রী সত্যেন দাস
বিকাশ	-	পবিত্র মুখার্জী
দুলাল	-	মিলন দাস
নৃপতি	-	আশিষ সাহা
সুবিমল	-	দিলীপ সাহা
গোকুল	-	রাজেন মজুমদার
ভকু প্রধান	-	অজিত মহন্ত
সাকরেত (বিশু)	-	অভিষেক মিত্র
এস.পি.	-	নেপথ্য কণ্ঠ (অমলেশ মিত্র/সাধন মজুমদার)
দারোগা	-	শ্রী স্বপন সরকার
ছোট বাবু	-	মানস চক্রবর্তী
পুলিশ	-	সৌমেন সমাজদার
সুধীন	-	স্বপন সান্যাল
মহিম	-	স্বপন দাস
সুবল	-	চন্দন দাস
সাংবাদিক	-	সুতপা সাহা

নাটক-দায়বদ্ধ

নাটককার	-	চন্দন সেন
পরিচালক	-	সাধন সমাজদার
সময়	-	২০০৮, ৩ ফেব্রুয়ারী
মঞ্চরূপায়ন	-	সত্যেন দাস, ইন্দ্রনীল দাস
আলোক সজ্জা	-	নিমাই দে
আবহ সঙ্গীত	-	মুকুট মজুমদার
অভিনয় রজনী	-	তিন

চরিত্র লিপি:

গগন	-	সাধন মজুমদার
মিতা	-	নিলীমা সাহা
দেবু	-	ইন্দ্রনীল দাস
ঝিনুক	-	দীপা রায়
জীবন	-	অজিত মহন্ত
সন্ধ্যা	-	রূপা রায়
মাষ্টার	-	স্বপন সান্যাল

বোয়াদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা

বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা ১৯৪২ সালে স্থাপিত হলেও বর্তমানেও তারা অভিনয় করে চলেছে। গ্রুপ থিয়েটারের যুগে এসে তারা গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা পালন করছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে তাদের কোনো স্থায়ী মঞ্চছিল না। পাঁচের দশকের শুরুতেই তাঁরা মঞ্চ তৈরীর দিকে ঝুকলেন।

অমূল্য সরকার প্রায়ই থিয়েটার হলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন। সংস্থার সকলে সিদ্ধান্ত করলেন এমন একটা ঘর করা হবে যেখানে নাটকও করা যাবে আবার যাত্রার সাজঘর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সেই অনুসারে ১৯৫২/১৯৫৩ সালে দুই কক্ষ বিশিষ্ট মাটির দেওয়াল ঘর উপরে ঘরের ছাউনি তৈরী করা হয়। সামনে ড্রপ ফেলার জন্য একটা সরু জামগাছ গোটাটাই দেওয়ালের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। এই ভাবে নির্মাণ হয়েছিল বোয়ালদাড়ে মাটির থিয়েটার ঘর। মাটির নাট্য মঞ্চ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ খরের চাল ফুটো হয়ে মাটির দেওয়াল গলে যেতে থাকে। মাটির নাট্যমঞ্চে দু'দশক অভিনয় (নাটক ও যাত্রা) চলার পরে ধীরে ধীরে সংস্কারের অভাবে ভাঙতে ভাঙতে এক সময় মাটির ঢিপি হয়ে পড়ে থাকে। নাট্যমঞ্চের এমতাবস্থায় বোয়ালদাড়ে নাটক অভিনয় বন্ধ থাকেনি। নাট্যপাগল মানুষগুলি গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে ৬-৮ টা চৌকি এনে, কাপড় এনে অস্থায়ী মঞ্চ ও অস্থায়ী গ্রীণরুম বানিয়ে নাটক ও যাত্রা অভিনয় চালাতে থাকেন। এই অস্থায়ী মঞ্চে প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় অভিনয় চলতে থাকে।

১৯৯৫ / ১৯৯৬ সালে গ্রামের বারোয়ারী মন্ডপের বারান্দায় ৪০-৪৫ জন মাননীয় ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন একটি স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করা হবে। উপস্থিত সদস্য এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন - অমূল্যচরণ সরকার, সতীশ চন্দ্র মন্ডল, অমিয় সরকার, রণজিত সমাজদার, শ্যামাপদ ঘোষ, অমিত সরকার প্রমুখ। বিস্তারিত আলোচনার পর ৭ জনের একটি দল তৈরী করে তাঁদের উপর কার্যপরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল।

সংস্থার তেমন তহবিল ছিল না কিন্তু তাঁরা একটা সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুজিত শীল, সমরেশ গোস্বামী, কাঞ্চন চক্রবর্তী ও অমিত সরকার মিলে মটর বাইক করে বিভিন্ন ইটভাটা ৬ হাজার ইট সংগ্রহ করে লরিতে করে ইট নিয়ে আসেন হয়। গরুর গাড়িতে করে গ্রামেরই মানুষ নদী থেকে বালি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। জেলা পরিষদের তৈরী রাস্তা ও কালভার্ট তৈরীর পর পরে থাকা ইটের টুকরো পাথর কুচি গ্রামেরই মানুষ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এরপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অনুরোধ করে ২০-২৫ বস্তা সিমেন্ট সংগ্রহ করা হল। শ্রমিকদের টাকা গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর ৫ তারিখে নাটককার শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ফিতা ধরে মাপজোক করলেন এবং শিলান্যাস করলেন। তৈরী হল ছাউনি বিহীন খোলা মঞ্চ। ১৯৯৭ সালেই খোলা মঞ্চেই বাসন্তী পুজোর সময় যাত্রানুষ্ঠান হল।

স্টেজের উপর ছাউনি দেওয়ার জন্য আমগাছ পুরানো তালগাছ কেনা হয়েছিল। সংস্থার লোকজন ভেবেছিলেন কাঠের ফ্রেম করে টিনের ছাউনি দেবেন। কিন্তু বালুরঘাটের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শ্রী বিশ্বনাথ লাহার পরামর্শ ক্রমে তাঁরা লোহার স্ট্রাকচার তৈরির কথা ভাবেন। লোহার স্ট্রাকচার তৈরি করার মত অর্থ সংস্থার ছিলনা। তাই তাঁরা পূর্বে ক্রয় করা আমগাছ, তালগাছ বিক্রি করে দিলেন। তরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং লোহার স্ট্রাকচার করলেন। বিশ্বনাথ লাহার কাছে সংস্থা কিছু আর্থিক ঋণি হয়ে থাকে। লোহার স্ট্রাকচার বানানোর সময়

নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও নাটককার, প্রাবন্ধিক নির্মলেন্দু তালুকদার তাঁদের মূল্যমান পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মঞ্চ নির্মাণ হবার পর এবার রিহার্সেল ঘর, সাজঘর (গ্রীণ রুম) তৈরীর জন্য রণজিত সমাজদার (সংস্থার সম্পাদক), রণজিত সরকার, সুজিত শীল, হরেন রায়, বিদ্যুৎ চৌধুরী পরিমল চৌধুরী, সুনীল চৌধুরী এবং সাব - এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ২০০২ সালে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আলাপ আলোচনা করে গ্রীণরুমের কাছ শুরু করা হয়। সেখানে প্রতিদিন কাজকর্ম দেখার শোনার জন্য নাট্যকর্মী টুলুকে (পরিমল খাঁ) দায়িত্ব দেওয়া হয়। বালুরঘাটের উত্তমাশার রবি মিস্ত্রী মশাইকে গ্রীণরুম নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০৪ সালে জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ২০০৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর নবনির্মিত নাট্যমঞ্চ ও সাজঘরের উদ্বোধন হল পাঁচদিন ব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন শ্রী কান্তি বিশ্বাস, শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস, শ্রী শ্রীকুমার মুখার্জী এছাড়াও ছিলেন নাটককার, অভিনেতা শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং স্থানীয় অভিনেতা, অভিনেত্রী, শ্রী প্রণব মুখার্জী (গায়ক) ও স্থানীয় নাট্যকর্মী বৃন্দ। শ্রীকুমার মুখার্জী একবার যাত্রানুষ্ঠানে এসে বলেছিলেন ''কখনও বা রাজনীতির প্রয়োজনে বহু জায়গায় ঘুরেছি এমন যাত্রার আসর আর সুন্দর আয়োজন আমি দেখিনি। এই প্রতিষ্ঠান আর আপনাদের প্রচেষ্টা বেঁচে থাকুক।''[৩০]

যদিও নাট্যমঞ্চই আমার আলোচ্য বিষয় কিন্তু বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যমঞ্চে যাত্রা ও নাটক সমানতালে অভিনয় হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যাত্রা ও নাটকের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য রয়েছে মঞ্চ, উপস্থাপন পদ্ধতিতে এবং বিষয়বস্তুতে। যাত্রার মঞ্চটি সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত। সাজঘর থেকে অভিনেতা, অভিনেত্রী হেটে মঞ্চে উঠে আসেন অভিনয় করার পর আবার ঐ পথেই প্রস্থান করেন। মঞ্চের কোনো দিকই ঘেরা থাকেনা। কোথাও পর্দা পর্যন্ত থাকে না। যাত্রায় দর্শক মঞ্চের সামনে দুই পাশে এমনকি পেছনেও থাকে। যাত্রার পাকাপোক্ত প্রেক্ষাগৃহ নেই। কিন্তু নাটক করার যে প্রেক্ষাগৃহ হয় পাকা (ইটের তৈরী); ছাদও কংক্রিটের হয়। যাতে কথোপকথনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্তে থাকে উচ্চ মঞ্চ যার চারদিকে দেওয়াল। সামনে থাকে পর্দা তার সামনে বিস্তৃত দর্শকাসন। মঞ্চের পেছনে থাকে সাজঘর। মঞ্চের এপাশ ওপাশ থেকে অভিনেতারা প্রবেশ প্রস্থান করে। যাত্রার মৌলিক রচনা আজও উচ্চস্তরের সাহিত্যগুণ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। নামকরা নাটককারেরা কখনো সাহিত্যগুণ সম্পূর্ণ যাত্রা পালা রচনা করেন না। তাই উপযুক্ত যাত্রাপালারও অভাব। কেবল মাত্র ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক যাত্রাপালা দেখা যায়। যাত্রাপালার বিষয়বস্তু গুলি গতানুগতিকতার দোষে দুষ্ট। যাত্রা বা নাটক যে মাধ্যমই হোক না কেন বর্তমান প্রযুক্তির যুগে হারিয়ে যেতে বসেছে। চলচিত্রের বহু নামকরা শিল্পিরা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে গ্রামের যাত্রানুষ্ঠান করতে আসে। তবে সেখানে উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে যায়। কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠিত অভিনেতাদের দেখার জন্য দর্শক সমাগম হয়। কিন্তু প্রকৃত দর্শক প্রকৃত যাত্রার স্বাদ পান না। তাছাড়া যাত্রার সঙ্গে মানুষের রুজিরোজগার জরিয়ে আছে। অনেক শিল্পী আছেন যাদের জীবিকার একটা অংশ এখানে। এছাড়া যারা আলোক শিল্পী মিউজিশিয়ান, মেক আপম্যান, এদের সকলেরই কিছু রোজগার হয় এখান থেকে। তাই যাত্রা শিল্পের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আজ সবই লুপ্তপ্রায়।

বোয়ালদাড়ে ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রম্পটর বাদ দিয়ে পার্ট মুখস্থ করে তরুণ অভিনেতাদের দিয়ে 'কেদার রায়' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। ''অবশেষে কালীপূজার পরদিন রাত্রে

নাটক মঞ্চস্থ করলাম। ভালই দর্শক ও শ্রোতা হল। কারণ আশে পাশে কোন গ্রামেই কালীপূজায় কোনো নাট্যনুষ্ঠান হত না, নাটক ভালো হল। প্রম্পটর বাদ দিয়ে। সবার পার্ট সবারই মুখস্থ।''[৩১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে তখনও পর্যন্ত প্রম্পটর সাহায্য নেওয়া হত। ১৯৬৮ সালে নাটককার, অভিনেতা পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রথম পার্ট মুখস্থ করে 'অমৃতস্য পুত্রা:' নাটকটি অভিনয় হয়। ১৯৬০ সালে বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থা একটি সাহসী প্রযোজনা করে। বোয়ালদাড়ের মত গ্রামে যেখানে শহরের ছোয়া নেই, কিন্তু মানুষের মন ছিল আধুনিক। ১৯৬০ সালে প্রথম বোয়ালদাড়ের নাটকে মহিলা চরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করেন। তবে বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থার প্রধান অভিনেতারা (দল) এটা করতে পারেননি, অপেক্ষাকৃত তরুণ অভিনেতারা এই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল। মহিলাদের দিয়ে অভিনয় করানোর কথা উঠতেই প্রবীনদের সঙ্গে নবীনদের মত বিরোধ দেখা গেল। নবীন অভিনেতারা '' অনিল, ভীকু, দুখু, আমি আলোচনা করে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ''আজকাল'' নাটক মঞ্চস্থ করবো স্থির করলাম। ..... দুইটি নারী চরিত্র ছিল। একটি নববধু একটি কুমারী মেয়ে ছাত্রী নাটকে নামতে রাজী হল।''[৩২] উক্ত দুই জন হলেন নববধূ শোভা চৌধুরী (সুনীল চৌধুরীর স্ত্রী), অপর জন ছাত্রী জ্যোৎস্না সমাজদার (অনীল সমাজদারের বোন)। সময়টা ছিল ১৯৬০ সাল অক্টোবর মাস কালীপূজার পরের রাত্রি। যদিও ১৯৫৬ সালে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে 'কালিন্দী' নাটকে প্রথম মহিলা শিল্পী অভিনয় করেন। কিন্তু বালুরঘাটের দর্শক, সমাজ আর অজ গ্রামের দর্শক ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। নাটকে মাইকের ব্যবহারও বোয়ালদাড়ে জেলার মধ্যে প্রথম। 'আজকাল' নাটকে স্ত্রী চরিত্রে নারী এবং মাইকের ব্যবহার করে বহুযুগের পালিত ও কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদ মানসিকতা ভেঙ্গে দেয়। ''মাইকে অভিনয় এই জেলায় এই প্রথম।''[৩৩] এই দুটি যুগন্তকারী ঘটনা ঘঠিয়েছিল বোয়ালদাড়ের অপেক্ষাকৃত নবীন অভিনেতারা। ১৯৬০সালের পূর্বে সৈদপুরে জ্যোতিশ্বর সরকার মেয়েদের দিয়ে 'শকুন্তলা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু এই নাটকের পুরুষের ভূমিকায় মেয়েরাই পুরুষ সেজেছে। জ্যোতিশ্বর সরকারের ভাবটি উল্লেখ করেন সুনীল চৌধুরী ''স্ত্রী পুরুষের মিলিত অভিনয় মঞ্চস্থ করে, মধ্যযুগের রক্ষণশীলতার গন্ডী ভেঙ্গে ফেলে। পুরনো যুগের অবসান ঘটিয়ে বোয়ালদাড় এই জেলার নব-নাট্য আন্দোলনের অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে।''[৩৪] ১৯৬০ সাল নাগাদ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থাতে পুরুষরা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে চলেছে তখন তথাকথিত শহুরে সংস্কৃতি থেকে অনেকটা দূরে, ষাটের দশকের শুরুতে সংস্কারের সমস্ত বেড়াজাল ছিন্নকরে বাড়ির মেয়ে-বৌদের পর পর পুরুষের সঙ্গে সাবলীল ভাবে অভিনয় করা সময়ের বিচারে নাট্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ নয় কি?

নাট্যসংস্থাটির প্রেরণায় বোয়ালদাড় গ্রামের মধ্যেই ৫/৬টি নাটকের দলের সৃষ্টি হয়েছে। নারী-পুরুষের দল, মহিলা দল, ছেলেদের দল এবং কিশোর - কিশোরীর দল, আদিবাসীদের দল। এই সমস্ত দলের উৎস 'বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা'। গ্রামের মধ্যে যে ছোট ছোট নাট্যদল গুলি হয়েছে তাদের নির্দেশনা নিজেরাই করে থাকে।

অভিনেতাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ নাটক রচনাতেও হাত লাগিয়েছিলেন। ভিকু অর্থাৎ আনন্দ মোহন তলাপাত্রের লেখা 'ইঙ্গিত' নাটকটির বিষয় হল কারখানায় নারী শ্রমিকদের জীবনে শোষণ বঞ্চনার কাহিনি। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, নাটকটিতে ১৪/১৫ জন নারীচরিত্র ছিল। সমস্ত মেয়ে গ্রামেরই ছিল। নিজেরা নাটক নিয়ে অভিনয় করার মত সাহস রাখত বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থা।

লোক সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হল বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা। গ্রামের কোনো

সংস্থা (১৯৪২) এখনো পর্যন্ত নাটক যাত্রা পরিবেশন করে চলেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে সকলেই যেন সৃজনের আবেগে ভরপুর। তবুও বিজ্ঞানের ও সভ্যতার অকল্পনীয় বিবর্তনের ধারায় যাত্রাপালা, গ্রুপ থিয়েটার লোকসঙ্গীত, লোকসংস্কৃতি সহ গ্রামীন পরিবেশের জীবনাচরণেও লাগছে আধুনিকতার স্পর্শ। কাজেই প্রাচীন জীবনমুখী সেই যাত্রাপালা বা নাটক বা অন্যান্য সংস্কৃতি চর্চাকে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন। আধুনিকতাকে আত্তিকরণ করেও যাত্রা নাটকের সেই অসাধ্যসাধন প্রয়াস আজ অম্লান, প্রবাহমান রয়েছে 'বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা।'

১৯৪২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত যাত্রা পালা ও নাটকের নামঃ-

১। সপ্তরথী	(পৌরাণিক পালা)
২। মেবার কুমারী	(যাত্রাপালা)
৩। মীনা	(নাটক)
৪। আজকাল	(নাটক)
৫। বঙ্গবীর	(নাটক)
৬। কেদার রায়	(নাটক)
৭। পাষাণী	(নাটক)
৮। চাঁদ রায়	(যাত্রাপালা)
৯। পার্থসারথী	(নাটক)
১০। লাল পাঞ্জা	(নাটক)
১১। মানুষ	(সামাজিক পালা)
১২। সিন্দু গৌরব	(যাত্রা)
১৩। বঙ্গে বর্গী	(যাত্রা)
১৪। চন্দ্রগুপ্ত	(যাত্রা)
১৫। ঈশাখাঁ	(যাত্রা)
১৬। কয়েদী	(যাত্রা)
১৭। চোর	(নাটক)
১৮। খ্যাতির বিড়ম্বনা	(নাটক)

১৯। তাসের ঘর (যাত্রা)

২০। দেশের ডাক (যাত্রা)

২১। কবি চন্দ্রাবতী (যাত্রা)

২২। শাজাহান (যাত্রা)

২৩। দেবলা দেবী (নাটক)

২৪। দূর্গেশ নন্দিনী (যাত্রা)

২৫। মহারাজ লক্ষণ মানিক্য (যাত্রা)

২৬। জিঘাংষা (যাত্রা)

২৭। কালা পাহাড় (যাত্রা)

২৮। বন্দীর ছেলে (যাত্রা)

২৯। যাদের দেখেনা কেউ (যাত্রা)

৩০। শেষ অঞ্জলী (যাত্রা)

৩১। সংগ্রাম (নাটক)

৩২। বাঘিনী (যাত্রা)

৩৩। জহ্লাদের দরবার (যাত্রা)

৩৪। অভিযান (যাত্রা)

৩৫। একফোঁটা রক্ত (যাত্রা)

৩৬। ধর্মের বলি (যাত্রা)

৩৭। সিরাজদৌল্লা (যাত্রা)

৩৮।দেনা-পাওনা (যাত্রা)

৩৯। মাটির ঘর (নাটক)

৪০। রূপবান (যাত্রা)

৪১। রামবনবাস-রাবনবধ (যাত্রা)

৪২। কৃপণের ধন (নাটক)

৪৩। লহনা-খুলনা (যাত্রা)

৪৪। চন্ডীতলার মন্দির (নাটক)

৪৫।শতাব্দীর পাপ (যাত্রা)

৪৬।মেজ বৌ (যাত্রা)

৪৭।মাটির কেল্লা (যাত্রা)

৪৮।কে দেবে কবর (যাত্রা)

৪৯। রাজবন্দী (যাত্রা)

৫০। মৃত্যুর ডাক (নাটক)

৫১। ভিকারী ঈশ্বর (নাটক)

৫২। লৌহ কপাট (যাত্রা)

৫৩। সিঁদুর নিওনা মুছে (যাত্রা)

৫৪। কাঁকনতলার মেয়ে (যাত্রা)

৫৫। সাত ভাই চম্পা (যাত্রা)

৫৬। অবিশপ্ত নীলকুঠি (যাত্রা)

৫৭। সেই রক্তঝরা দিনগুলি (নাটক)

৫৮। দু-টুকরো সংসার (নাটক)

৫৯।শেষ নমাজ/বাঙ্গালী (যাত্রা)

৬০। অথ ভগবতী উপাখ্যান (নাটক) সম্পূর্ণ মহিলাদের অভিনীত

৬১। মন্দিরে আজান (যাত্রা)

সুদুর অতীতে বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা প্রযোজিত বিভিন্ন পালার একাধিক রজনীতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের সম্ভাব্য নামের তালিকাঃ-

১। নিখিলেশ সরকার (নাড়ু বাবু) - সৈদপুর

২। জীতেন সমাজদার (টুলুবাবু)- সৈদপুর

৩। জীতেন্দ্র মোহন সরকার - ফুলঘরা

৪। জ্যোতিশ্বর সরকার - সৈদপুর

৫। ভবেশ চৌধুরী-সৈদপুর

৬। দূর্গেশ চ্যাটার্জী- জামালপুর, তপন, মহিলাচরিত্র

৭। অরুণ চ্যাটার্জী (হাবলদা) মহিলা চরিত্র

৮। অশ্বিনী ঘোষ- বালুরঘাট আনন্দবাগান,

৯। কালীদাস সান্যাল বালুরঘাট,

১০। কাশীনাথ ঘোষ- বিজয়শ্রী

১১। শিবেন অধিকারী- তিলন (প্রয়াত)

১২। বীরেশ্বর সরকার- সৈদপুর (প্রয়াত)

১৩। মংলা চৌধুরী - কাশিপুর

১৪। প্রণব সমাজদার - সৈদপুর

১৫। বিজন ব্যনার্জী - বাহিচা,ধর্মপুর (মহিলা চরিত্র)

১৬। কমল ঘোষ - সৈদপুর

১৭।মণি সরকার (দরজি)-খাসপুর

১৮। দীনবন্ধু দাস - খাসপুর (স্ত্রী চরিত্র)

১৯। ননী মহন্ত - পুনতৈর কুমারগঞ্জ

২০। ভবেশ চন্দ্র মন্ডল - (বিলপাড়া) খাসপুর

২১। মাখন সরকার -(বিলপাড়া) খাসপুর

২২। কমল কান্তি সমাজদার - সৈদপুর

২৩।কল্যান কুমার সমাজদার - সৈদপুর

২৪।জগদীশ ঘোষ- চকভৃগু

২৫। রামপদ সমাজদার-ভিকাহার

২৬।ঝড়ু সমাজদার - ভিকাহার

২৭।উমানাথ সরকার- ভিকাহার

২৮।কালী মজুমদার-বালুরঘাট

২৯।দেবল রায়-বালুরঘাট

৩০।শ্রীশ চন্দ্র সাহা (নিতাইবাবু)- মেনাপুর, কুমারগঞ্জ

৩১।মোহিনী শীল-দহঘাট,চিঙ্গিশপুর

৩২।পারুল সরকার- ইন্দ্রা সেওয়াই

৩৩।উপেন সরকার -মুগলিশপুর কুমারগঞ্জ

৩৪।মৃগেন ঘোষ-বড় কাশীপুর

৩৫। দেবেন ঘোষ- বড় কাশীপুর

৩৬। নিবারণ চন্দ্র দাস (ধলুদা) -বড় কাশীপুর

৩৭। সত্যরঞ্জন ঘোষ-বড় কাশীপুর

৩৮।জানকী বল্লভ চৌধুরী-বোয়ালদাড়

৩৯।অমূল্য চরণ সরকার -বোয়ালদাড়

৪০।অমূল্য রতন শীল -বোয়ালদাড়

৪১।ধীরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী-বোয়ালদাড়

৪২।জ্যোতিশ চন্দ্র গোস্বামী-বোয়ালদাড়

৪৩।সজনী কান্ত রায় -বোয়ালদাড়

৪৪।মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী -বোয়ালদাড়

৪৫। অনিল বল্লভ চৌধুরী -বোয়ালদাড়

৪৬।ভূপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী -বোয়ালদাড়

৪৭।রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য (নবকাকু)-বোয়ালদাড়

৪৮।জগদীশ গোস্বমী -বোয়ালদাড়

৪৯।শশধর মহান্ত -বোয়ালদাড়

৫০।সুনীল চৌধুরী-বোয়ালদাড়

৫১।নির্মল রায়-বোয়ালদাড় (স্ত্রী ভূমিকায়)

৫২। অধীর সরকার (দুখু) -বোয়ালদাড়

৫৩। আনন্দ মোহন তলাপাত্র -বোয়ালদাড়

৫৪। অনিল সমাজদার- বোয়ালদাড়

৫৫। রামরঞ্জন সমাজদার (ক্যাবলা)- বোয়ালদাড়

৫৬। অজিত কুমার শীল-বোয়ালদাড়

৫৭। অজিত সরকার- বোয়ালদাড়

৫৮।সঞ্জয় রায় (বাবলা) -(বোয়ালদাড়)

৫৯।রণজিত সরকার-বোয়ালদাড়

৬০।শঙ্কর রায় -বোয়ালদাড়

৬১।সুনীল ভট্টাচার্য -বোয়ালদাড়

৬২।প্রসেনজিৎ চৌধুরী-বোয়ালদাড়

৬৩।দীনবন্ধু বর্মন-বোয়ালদাড়

৬৪।সুভাষ চন্দ্র সাহা- বালুরঘাট

৬৫।প্রশান্ত সরকার-বোয়ালদাড়

৬৬। অপূর্ব সরকার-বোয়ালদাড়

৬৭।বিশ্বনাথ চৌধুরী-বোয়ালদাড়

৬৮।নীরেন দাস -বালুরঘাট

৬৯।প্রবীন রায় -বড় কাশীপুর

৭০।বিপুল চক্রবর্ত্তী -উদয় পাঁচগাঁ

৭১।রাম চৌধুরী -বোয়ালদাড়

৭২।দোলন ঘোষ -ভারেন্দা (মহিলা চরিত্র)

৭৩।দীনেশ বসাক -পোড়ামাদল (মহিলা চরিত্র)

৭৪। অমর ভাদুরী - বোয়ালদাড় (মহিলা চরিত্র)

৭৫।সতীশ মহন্ত -নলতাহার

৭৬।শচীন রায় (মন্টু) -ভিকাহার

৭৭।নীরেন কুন্ডু -বালুরঘাট (মহিলা চরিত্র)

অতীতে মহিলা চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন

১।নিয়তি দাস-খাসপুর

২।কল্পনা দাস-চকভৃগু (প্রয়াত)

৩।রীণা লস্কর -বালুরঘাট

৪।দিপালী ঘোষ-বড় কাশীপুর

৫। চানু ঘোষ-বড় কাশীপুর

৬।সুধা সরকার- খরাইল (প্রয়াত)

৭।রেখা চৌধুরী-বোয়ালদাড়

৮।সন্ধ্যা চৌধুরী- বোয়ালদাড়

৯।শোভা চৌধুরী- বোয়ালদাড়

১০।রত্না গোস্বামী- বোয়ালদাড়

১১। চন্ডী ব্যানার্জী-বোয়ালদাড়

১২।সন্ধ্যা সমাজদার-বোয়ালদাড়

১৩। গৌরী সিং -বোয়ালদাড়

১৪।মঞ্জু খাঁ-বোয়ালদাড়(প্রয়াত)

১৫।জ্যোৎস্না সমাজদার

১৬। মানা খাঁ

১৭। অর্চনা সরকার-বোয়ালদাড়

১৮।রীণা চৌধুরী-বোয়ালদাড়

১৯।স্নিগ্ধা গোস্বামী (শিলা) বোয়ালদাড়

২০। প্রমিলা রায়-বোয়ালদাড়

২১।ইরা চৌধুরী-বোয়ালদাড়

২২।স্মৃতিকণা মন্ডল-বোয়ালদাড়

২৩। প্রীতিকণা মন্ডল

২৪। ইতি মন্ডল-বোয়ালদাড়

২৫। বুলি ভট্টাচার্য-বোয়ালদাড়

২৬।ইন্দিরা চক্রবর্তী(বুলা)-বোয়ালদাড়

২৭।পপী ব্যানার্জী-বোয়ালদাড়

২৮।শেফালী রায়-বোয়ালদাড়

২৯।দীপু রায়-বোয়ালদাড়

৩০।পেপুন ঘোষ-খাসপুর-মোহনা

৩১।মিনাক্ষী সরকার-পাঞ্জুল

৩২।প্রতিমা দেবনাথ-ত্রিমোহিনী

অতীতে নর্তকীর ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন

১। সুনীল চৌধুরী -বোয়ালদাড়

২। জগদীশ গোস্বামী -বোয়ালদাড়

৩।পূর্ণচন্দ্র মহান্ত -বোয়ালদাড়

৪। কুবরা হাজরা -বোয়ালদাড়

৫। ধলু রায় -বোয়ালদাড়

৬। নিবারণ চন্দ্র দাস -বোয়ালদাড়

যাঁরা ছিলেন গানের মাষ্টার অথবা সুরকার

১। কুমদিনী ঘোষ -কাঁজিয়ালশী

২। ফকির দাস -(বাবাজী বলে পরিচিত)

৩।শরৎ রায় -পাগলীগঞ্জ

৪। সূর্য মাষ্টার(বহু পুর্বে নদীয়ার মানুষ)

৫।দীনবন্ধু দাস(কুকরামাষ্টার-খাসপুর)

বর্তমানে

১। সমীর রায় -বালুরঘাট

২। বিদ্যুৎ সরকার(মঞ্জু মাষ্টার-পারপতিরাম)

ফ্লুট-ক্ল্যারিওনেট এ্যালথ্রোন-বাঁশের বাঁশি যাঁরা বাজাতেন

১।দেবেন মহান্ত	-পোড়ামাধাইল	৭।ধীরেন নট্ট	-বালুরঘাট
২।রামরেণু মহান্ত	-পোড়ামাধাইল	৮। সুকুমার ঘোষ	-বালুরঘাট
৩। দেবেন নট্ট	-বালুরঘাট	৯। ভবেশ বর্মন	-চিঙ্গিশপুর
৪।গোবিন্দ নট্ট	-বালুরঘাট		
৫।খগেন নট্ট	-বালুরঘাট		
৬।বাদল নট্ট	-বালুরঘাট		

তবলা-ঢোলক যাঁরা বাজাতেন

১। সন্ন্যাস দাস- পাগলিগঞ্জ

২। শচীন দাস - মাহিনগর

৩।সুধীর মালী - দাশুল

আদিকাল থেকে আমাদের নাট্য সংস্থায় যারা ড্রেসার ও মেক আপ ম্যান

১।নীরেন কুন্ডু -বালুরঘাট-

২।দ্বিজেন ঘোষ-পতিরাম-

৩। মালাকার বাবু-পতিরাম-

৪।নরেশ কর্মকার-নয়াবাজার-

৫। মন্টু অধিকারী-সাহেবকাছারী-

৬।মন্টু পাল - নেপালীপাড়া-বালুরঘাট-

৭।সত্যেন দাস-খাসপুর-

যাত্রাদলের বিবেক

আমাদের যাত্রাদলে 'বিবেকের' ভূমিকায় ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করছেন সমীর রায় (বালুরঘাট)। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবছর বিকাশ পাল (ফুলবাড়ি) মাঝে কখনও সৈদপুর গ্রামের কানু সরকার যাত্রা দলের বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

তরুণতীর্থ ঃ হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যখন সপ্তম / আষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন নির্মেন্দু তালুকদার, জীবন কানাই মুখোপাধ্যায় মিলে গড়ে তোলেন 'তরুণতীর্থ' (১৯৫৩) নাট্য সংস্থা। পরবর্তীকলে শ্রী মনোরঞ্জন কর্মকার, দেবল রায়, অন্তিম তরফদার, ব্রজবল্লভ সাহা, মানস ঘোষ (বাবলু), স্বপ্না রায়, তরুণতীর্থে যোগদান করেন। এই সংস্থার কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। সে সময় দুর্গা পুজাতে অবশ্যই এবং অন্য সময়ে পাড়ায় পাড়ায় মঞ্চ বেঁধে যে নাটক গুলি পরিবেশিত হত সেগুলি কোনো নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকত না। নাটক আরম্ভ হবার কোনো নিদিষ্ট সময় ছিল না। তরুণতীর্থ প্রথম দেখাল কী ভাবে নাটক শুরু হয় এবং শেষ হয়,কখন যবনিকা ওঠে পড়ে। তরুণতীর্থের নাটক প্রযোজনায় বালুরঘাটের দর্শকেরা প্রথম বুঝতে পারলেন সিনেমার মত নাটক ও নির্ধারিত সময়ে ঘড়ির কাটা মেনে শুরু হতে পারে। সময়ানুবর্তিতা তরুণতীর্থের এক বড় সম্পদ। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এই সম্পদটিই ত্রিতীর্থের মহতি আঙ্গিনায় নিয়ে যান। তরুণতীর্থের প্রযোজনায় ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটককার নির্মলেন্দু তালুকদারের রচিত নাটক গুলি এখানে অভিনীত হয়েছে।

তরুণতীর্থের উল্লেখযোগ্য নাটক ১৯৫৫ /১৯৫৭ সালে 'শেষ কোথায়', ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে অভিনীত হয় - 'চকমকি', 'শেষ থেকে শুরু', 'দায়েপরে দারগ্রহ' , 'পাখির বাসা', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', 'সিরাজের স্বপ্ন', 'ডঃ মিস কুমুদ', 'বিলাস কুঞ্জ বোর্ডিং'। নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'চেকভের' এর গল্প অবলম্বনে লেখা 'হাইপারবোল' (১৯৬৫) নাটকটি দর্শক মন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। ১৯৬৮ সালে অভিনীত হয় 'রজনী গন্ধা', 'ছেঁড়াকাগজের ঝুড়ি', 'আক্কেল সেলামি', 'পাপ ও পাপী'। তরুণতীর্থের সমস্ত নাটকই পরিচালনা করেছেন নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় । নাটকগুলি সবই মঞ্চ সফল নাটক। উক্ত নাটকগুলি কখনো মাঠে মঞ্চ বেঁধে ,আবার কখনো নাট্যমন্দিরে টিকিটের মাধ্যমে অভিনীত হয়েছিল। জীবনকানাই মুখোপ্যাধ্যায়ের সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক অভিনয় দর্শক মন্ডলীকে বিশেষ ভাবে আপ্লুত করত। তরুণতীর্থে আর এক বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন তিনি দেবল রায়।

বিদেশী নাটকের বাংলা অনুবাদ নাটক বালুরঘাটে তরুণতীর্থই প্রথম দেখাল সেটাও বহু প্রতিভা সম্পদ নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এর কল্যানে। প্রকৃত পক্ষে বালুরঘাটের নাট্যকর্মীদের নাট্য চিন্তার গতিপথ নতুন ভাবে প্রভাবিত করেছিল তরুণতীর্থের নাট্যভাবনা ,নাট্য পরিচালনা ও নাটক নির্বাচনে।বিশেষ করে 'পাখির বাসা', 'শেষ থেকে শুরু', 'নাট্য কারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' - এই নাটক গুলি। ১৯৬৮ সাল নাগাদ নাট্যমন্দির আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় তরুণতীর্থের প্রযোজনায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'করুণা করো না' নাটকটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। 'করুণা করো না' নাটকটি অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শ্রীমতি নিরুপমা সরকার , শ্রীমতি বিথী সরকার ও শ্রীমতি মনি সরকার এই নাট্য সংস্থার প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন। তরুণতীর্থের মেকআপ করতেন নালু পাল, কালি হোড় (অভিনয় করতেন, গান করতেন, ছবি আঁকতেন, মেকআপ দিতেন)।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও নির্মলেন্দু তালুকদারের সম্পাদনায় তরুণতীর্থে নাট্য সংস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত তখন হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরে যোগ দেন (১৯৬৭)। এই সময় থেকে তরুণতীর্থের প্রযোজনা কমতে থাকে। নাট্য মন্দিরে সদস্য থাকা কালীন তরুণতীর্থ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধোনে যখন 'রজনী গন্ধা'-র প্রস্তুতি চলছে তখন তরুণতীর্থের সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছিল। এই সময় ত্রিশুল নাট্য সংস্থা ও নাটক করছিল। কিন্তু ত্রিশুল ,তরুণতীর্থ, নাট্যমন্দির কোন দলই সক্ষম ও শক্তিশালী ছিলনা। কোনো দলই একাধিক ভালো অভিনেতা ছিল না। যাঁরা অভিনেতা তাঁরা সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তখন নাটককার পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মনে হয় তরুণতীর্থ, ত্রিশুল মিলে কিছু করা যেতে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নাট্যমন্দিরের কিছু দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের অনুভূতি থেকেই সৃষ্টি হয় 'ত্রিতীর্থের' (১৯৬৯)। ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তরুণতীর্থ লুপ্ত হয়।

ত্রিশুলঃ গতানুগতিক নাট্যধারা থেকে বেড়িয়ে এসে ভালো নাটক করার তাগিদে, নাট্যমন্দিরের গতানুগতিক নাট্য ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ 'ত্রিশুল' এর প্রতিষ্ঠা ১৯৫৯-১৯৬০ সালে। সত্যরঞ্জন তালুকদার (গোবিন্দ) ,কানাই দত্ত , অবিনাশ দত্ত এই তিন জন মিলে এবং রঞ্জিত দত্তের (মেজদা নামে পরিচিত) উদ্যোগে 'ত্রিশুল' নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে। এঁদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন নীনা চ্যাটার্জ্জী, পঙ্কজ বিশ্বাস, সুধীর ঘোষ এবং আরোকিছু নাট্যামোদী যুবক ও যুবতি। প্রকৃত পক্ষে অবিনাশ দত্ত,কানাই দত্ত, সত্যরঞ্জন তালুকদার, এই নাট্য সংস্থার শুল ছিলেন। প্রয়াত নাটককার অভিনেতা অমলেশ মিত্র মহাশয়ের মতে, 'নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই ত্রিশুলের সৃষ্টি'। বালুরঘাটে কেবল বিনোদনের জন্য নাটক অভিনীত হত তা নয় , নাটকের উৎকৃষ্টতা, কি ভাবে শিল্প সম্মত নাটক পরিবেশন করা হয়, অভিনয় নিপুণতা নিয়েও আলোচনা করা হত। আর তার ফলশ্রুতি হিসাবেই বালুরঘাটের দর্শকরা ত্রিশুলের প্রযোজনায় বেশ কিছু সুন্দর নাটক দেখতে পেয়েছিল। ত্রিশুল নাট্যসংস্থার প্রথম নাটক সম্ভবত 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। ত্রিশুলের প্রথম প্রযোজনা ও নির্দেশনায় উল্লেখযোগ্য নাটক গুলি হল - 'বাকী ইতিহাস', 'মুক্তধারা', 'নানা রঙের দিনগুলি', 'শেষ সংলাপ', 'প্রেম পরীক্ষা', 'প্রতিদিনের নায়ক', 'রাক্ষস', 'পাখীর বাসা' প্রভৃতি। উক্ত নাটক গুলি অভিনয় করে এঁরা বালুরঘাটের নাট্য চর্চার গতিধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। অধ্যাপক প্রার্থপ্রতীম বক্সী ত্রিশূল এর পরিচালক ছিলেন।

১৯৬১ সালে ত্রিশূল নাট্যমন্দির মঞ্চে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সেখানে পাঁচ জনের বিচারক মন্ডলী গঠন করা হয়। উক্ত বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা নট শিবপ্রসাদ কর, বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিশীথ রঞ্জন আচার্য, স্থানীয় এ্যাডভোকেট ও নাট্যমন্দিরের সুগায়ক ও অভিনেতা কানাই চ্যাটার্জী,নাট্যমন্দিরের দিক্‌পাল অভিনেতা ফণি মুখার্জী ও বালুরঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শোভা মজুমদার। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বালুরঘাটের নাট্য আন্দোলন স্বীকৃতি পায়। ত্রিশুল এক সময় প্রতিযোগিতা মূলক নাটকেও অংশ গ্রহণ করেছে এবং পুরস্কারও পেয়েছে। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রীমতি আরতি তালুকদার এবং নিমু রায় যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান।

ত্রিশূলের প্রযোজনায় বহু প্রশংসিত নাটক রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা'। 'মুক্তধারা' অনেক বড় Production ছিল। ১৯৬৮ সালের কাছাকাছি সময়ে তরুণ রায় 'সারা বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা' করেন সেখানে অংশ গ্রহণ করে ত্রিশূল রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটক নিয়ে।

১৯৬৯ সালে ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার সঙ্গে ত্রিশূলের অন্তর্ভূক্তির ফলে এই ছোট সংহত নাট্য দলটি বিলুপ্ত হয়।

বিংশ শতাব্দী নাট্য সংস্থাঃ 'বিংশ শতাব্দী ক্লাব' ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শরীর চর্চা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় এদের যথেষ্ঠ সুনাম আছে। এই ক্লাবের নাট্য চর্চা শুরু হয় ১৯৬৫ সাল থেকে। এরা বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। বর্তমান জয়েন্ট কাউন্সিল অফিসের বারান্দায় এদের মহড়া হত। অভিনয় করত নাট্যমন্দিরে । অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক গুলি হল - 'বৌদির বিয়ে', 'চৌদ্দপাকে বাঁধা', 'রক্তে রোয়া ধান', 'জয়দেব', 'ডাকঘর', 'থানা থেকে আসছি'। অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - অরুণ সেন, প্রদ্যোৎ রক্ষিত, প্রিয় রঞ্জন সেন, গিরীশ সাহা, অরুণ দাস, মরণ সাহা। এই সংস্থার কোনো কোনো নাটকে বীরেন্দ্র খাঁ, অমলেশ মিত্র , আমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় করেছেন।

প্রাচ্যভারতী নাট্যসংস্থাঃ ছয়ের দশক থেকে 'প্রাচ্যভারতী ক্লাবে' নাট্যচর্চা হত। দুর্গাপুজোর পর বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত 'প্রাচ্যভারতী ক্লাব'। সেখানে নাটক ছিল একটি প্রধান অংশ। প্রাচ্যভারতীর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -'খ্যাতির বিরম্বনা'। প্রচ্যভারতী মঞ্চটি অন্য নাট্য দলও ব্যবহার করত। যেমন অমলেশ মিত্র এখানে 'কাবুলিওয়ালা' করেছেন। অভিনেতা / অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন - রাধাকমল মাহন্ত, কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডলি ঘোষ, সমীর কুমার সেনগুপ্ত, অজিত ঘোষ প্রমুখ। শীতল চক্রবর্তী ও কালি হোড় মেকআপ ও মঞ্চ সাজানোর কাজ করতেন।

লোকায়ন নাট্যসংস্থাঃ সুজিৎ ভট্টাচার্য নবদ্বীপে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুজিৎ ভট্টাচার্যের দাদা স্বর্গীয় অজিতেশ ভট্টাচার্য তাকে বালুরঘাটে নিয়ে আসেন। সুজিৎ ভট্টাচার্য্য ও আরো কয়েকজন মিলে ১৯৭২ সালে 'লোকায়ন' নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংস্থার প্রযোজনায় সুজিৎ ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত 'চেতনা' নাটকটি নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়। সুজিৎ ভট্টাচার্য্যের ছিল অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর অবাক করা কণ্ঠস্বর, সাবলীল অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। শ্যামলতনু দাশগুপ্তের 'বাদক' নাটকের ছায়া ছিল 'চেতনা' নাটকে। বালুরঘাটে 'লোকরঙ্গ' নামে আর একটি নাট্যসংস্থা ছিল। প্রকৃত পক্ষে 'লোকায়ন' ও 'লোকরঙ্গ' একই দল। 'লোকায়ন' ও 'লোকরঙ্গ' একই অভিনেতারা অভিনয় করতেন। লোকরঙ্গের প্রযোজনায় ও সুজিৎ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'অগ্নিগর্ভ লেনা'। এই নাটকটিতে অভিনয় করেন প্রদোষ মিত্র, সুজিৎ ভট্টাচার্য, শিবানী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, দিলীপ চৌধুরী। কিন্তু দুই সংস্থার অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - সুকুমার কুন্ডু, সুবীর চৌধুরী, শিবানী চক্রবর্তী, প্রদোষ মিত্র, সুজিৎ ভট্টাচার্য প্রমূখ।

তূণীরঃ সাতজন নাট্যপ্রেমী ছেলের উদ্যোগে 'তূণীর' নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। এই সাতজন ব্যক্তি হলেন - জয়ন্ত বিশ্বাস, সুজিৎ ভট্টাচার্য, প্রদোষ মিত্র, কল্যান দাস, দেবাশীষ

চক্রবর্তী, সুখেন্দু চৌধুরী, সুশোভন সমাজদার। তূণীরের প্রথম সম্পাদক সুখেন্দু চৌধুরী। এঁদের কেন্দ্রমনি ছিলেন সুজিৎ ভট্টাচার্য যিনি এসেছিলেন লুপ্ত 'লোকায়ন' নাট্য সংস্থা থেকে। কল্যান দাস ও জয়ন্ত বিশ্বাস এসেছিলেন 'যাত্রিক' থেকে এছাড়াও ছিলেন গগ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ বসু। সুজিৎ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় তূণীরের প্রথম নাটক রাধারমন ঘোষের 'শতাব্দীর পদাবলী'। ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর অভিনীত হয় নাট্যমন্দিরে। প্রথম রজনী অভিনয়ের পর বালুরঘাটে সারা পড়ে যায়। নাটকটির উপস্থাপনায়, পরিচালনায়, মঞ্চভাবনা, আলোকসজ্জা সমস্ত কিছুই ছিল আধুনিক মানের। একজন দর্শক বহু বার নাটকটি দেখেছেন। এমন কি এক রাতে দুটি শো ও করতে হয়েছে।

তূণীরের প্রযোজনায়, সুজিৎ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ১৯৭৪ সালে ২৬শে মে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অমিত ঘোষের 'ছুটির ফাঁদে' অভিনীত হয়। এই নাটকটি অভিনয় কালে একটা ঘটনা ঘটে তা হল এই প্রথম বালুরঘাটে নাটকের টিকিট কালোবাজারী হল। সংস্থার পক্ষ থেকে অচিন্ত্য গোস্বামীকে টিকিট না থাকার জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। নাটকটি ৪-৫ রজনী অভিনীত হয়। নাটকটি কলকাতা, কাটিহার, মালদাতেও অভিনীত হয়েছিল। 'ছুটির ফাঁদে' নাটকটি সমাদৃত হয়েছিল। এরপর জয়ন্ত বিশ্বাসের পরিচালনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'গিনিপিক' মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৪ সালে পতিরামে। ১৯৭৪ সালের ২৪শে নভেম্বর তূণীর পরিবেশন করে নাটককার অমল রায়ের নাটক 'দেওয়ালে পিঠ রেখে'। নাটকটি পরিচালনা করেন সুজিৎ ভট্টাচার্য। এই সমস্ত নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তূণীর প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। বালুরঘাটের নাট্যপ্রেমীরা যেমন নাটক করতেন, নাটক দেখতেন তেমনি নাটকের সমালোচনা ও করতেন। নাটকের গতি প্রকৃতি, উৎকর্ষতা নিয়ে আলোচনা সভাও বসত। ''এমনি একদিন আলোচনাসভায় নাটককার, পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তূণীর এর নাটক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন, 'কেন তোমাদের শো হলে তা হাউসফুল হয়ে যায়।' এমন মন্তব্য করেছিলেন নাটককার হলিমাধব মুখোপাধ্যায়।''[৩৫] প্রদোষ মিত্র এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় তূণীর অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এরপর সুজিৎ ভট্টাচার্যের অসুস্থতার কারণে তিনি জলপাইগুড়ি চলে গেলেন। তখন ভগ্নপ্রায় তূণীরের হাল ধরলেন প্রদোষ মিত্র (ভানু)। প্রদোষ মিত্রের পরিচালনায় প্রথম নাটক শ্যামলতনু দাশগুপ্তের 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুরও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি'। অভিনীত হয় ১৯৭৫ সালের ৮ই আগষ্ট।

এরপর তূণীর নাট্যসংস্থা নানা দুর্যোগের মধ্যে পড়ে। এই সংস্থার প্রাণপ্রতীম পরিচালক সুদক্ষ অভিনেতা সুজিৎ ভট্টাচার্যের অকালমৃত্যু, জয়ন্ত বিশ্বাস ও প্রদোষ মিত্রের অন্যত্র গমনের ফলে তূণীর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সুজিৎ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণপ্রতীম সংস্থার সদস্যগণ ওঁরই লেখা 'চেতনা' নাটকটি বিদেহী নাট্যপ্রেমীর প্রতিশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে দর্শকের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যায় তুণীর।

১৯৮৬ সালে তূণীর আবার জেগে ওঠে। প্রদোষ মিত্র বালুরঘাটে ফিরে আসেন, জয়ন্ত বিশ্বাস ও আসেন মাঝে মাঝে। এই সময় দলে যুক্ত হন যিষ্ণু নিয়োগী, নূপুর সাহা, প্রাণতোষ ভট্টাচার্য, শর্মিলা দত্ত, ঊমা ভট্টাচার্য, বৈশালী নাগ, সুমি চক্রবর্তী। ১৯৮৬ সালেই প্রদোষ মিত্রের পরিচালনায় মহাশ্বেতা দেবীর 'পাকাল' উপন্যাস অবলম্বনে 'পাকাল' নাটকটি (নাট্যরূপ প্রদোষ মিত্র) মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু নাটকটি তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

১৯৮৮ সালের ১৮ই মে প্রদোষ মিত্রের পরিচালনায় সমাদৃত হয়েছিল সেটি হল জাঁপাল সার্ত্র - এর 'ক্রাইম প্যাশনাল' অবলম্বনে সুব্রত নন্দীর 'একা একা' (রূপান্তর) এই নাটকটিতে অভিনয় করেন মধুমিতা বসু, প্রদোষ মিত্র, প্রাণতোষ ভট্টাচার্য, নূপুর সাহা, যিষ্ণু নিয়োগী। নাটকটি শিলিগুড়ি, মালদা, পাটনাতে অভিনীত হয়েছে। যীষ্ণু নিয়োগী ভীষণ ভালো অভিনেতা। তিনি অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান এই নাটকে। ১৯৮৬ সালে পাটনায় সারা ভারত নাটক প্রতিযোগিতায় 'একা একা' প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (যিষ্ণু নিয়োগী) দলগত প্রযোজনার দিক থেকে তৃতীয় হয় 'তূণীর' নাট্য সংস্থা। 'একা একা' নাটকের অভিনয়ে 'দিশারী' উত্তরবঙ্গ শাখা পুরস্কার পান নূপুর সাহা। ইতিমধ্যে নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 'গোধূলী বেলায়' নাটকটি প্রদোষ মিত্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। ১৯৯০ সালের ২০শে জুন জাপানী চিত্র পরিচালক আকিরাকুরোশোয়ার 'Seven Samurai' অবলম্বনে ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'শেষরক্ষী'। নাটকটি ৪ রজনী অভিনয় হয়েছিল। তেমন রেখা পাত করতে পারে নি। ১৯৯২ সালে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে 'সন্ন্যস্ত' নাটকটি তূণীরের প্রযোজনায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের মঞ্চস্থ হয়। তূণীর নাট্যসংস্থার শেষ নাটক ১৯৯৭ সালে শুভ্রাংশুশেখর মৈত্রের লেখা 'পদ্মাবতী কথা' ভবেন্দু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি ছিল নতুন আঙ্গিকের। উক্ত অভিনেতা ছাড়াও স্বদেশ সাহা, সব সাহা, মাধব সাহা, সৈকত দত্ত, গৌতম দেব, সুব্রত দেব, আশিষ চ্যাটার্জী- চিলেন তূণীরের নাট্যকর্মী। পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন নালন্দা বিদ্যাপীঠের শিক্ষক সুভাস সাহা, গৌরী অধিকারী (অধ্যাপিকা), ধীরেন আচার্য(অধ্যাপক)। নানা সময়ে বুদ্ধি যুগিয়েছেন নাটককার হরিমাধ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রাংশু মৈত্র ও দীপঙ্কর ব্যানার্জী। এছাড়াও ছিলেন দেব প্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিশঙ্কর চক্রবর্তী, সুবীর হোম, সঞ্জয় মুখার্জী, সঞ্জীব ভৌমিক, সঞ্জয় রায়, বিভু ভট্টাচার্য প্রমুখ।

রূপান্তর নাট্য সংস্থাঃ কয়েকজন নাট্যানুরাগী ব্যক্তি নিজেদের উদ্যোগে 'রূপান্তর নাট্যসংস্থা' ১৯৭৫ সালে গঠন করেন। নাট্যপ্রেমী মানুষের পাগলামি থেকে যেমন বালুরঘাটের অন্যান্য নাট্য সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি ভবেন্দু ভট্টাচায, সুব্রত মজুমদার,স্বপন দে, মিলন চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি মিলে রূপান্তর নাট্য সংস্থা গঠন করেন। রূপান্তরের প্রথম সম্পাদক ছিলেন গোবিন্দ ভট্টাচার্য। নাটক সাধারণ মানুষকে সুস্থ ও স্বাধীন ভাবে বাঁচার পথ দেখায়। এইজন্য রূপান্তর প্রগতিশীল নাটক ব্যতীত অন্য কোনো নাটক মঞ্চস্থ করত না। নাটক যে কেবল চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, একথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেই রূপান্তর নাট্য সংস্থা বালুরঘাটে সর্বপ্রথম পথনাটিকা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। 'জিওর্দনোর্ব্রুনো' (১৯৭৫) রূপান্তরের প্রযোজনায় বালুরঘাটের প্রথম পথ নাটক। নাটকটির উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা ছিল তবু নাটকটি করা হয়েছিল।রূপান্তর বেশ কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নাটক পরিবেশন করেছে। সবগুলি নাটকই বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়।

নাটক	নাটককার	পরিচালক	সময়
শূণ্যশতকিয়া	রাধারমন ঘোষ		১৯৭৫
নগুয়েন ভেনত্রয়	-------	ভবেন্দু ভট্টাচার্য	১৯৭৫
বিবসনাবৃহলনা	চিত্তরঞ্চন দাস	ভবেন্দু ভট্টচার্য	১৯৭৬

শিবের অসাধ্য	-------	সুব্রত মজুমদার	১৯৭৭
রামের পালা	-------	বঙ্কিম দে সরকার	১৯৭৭
ইতিহাস কাঁদে	রাধারমন ঘোষ	সুব্রত মজুমদার	১৯৭৭-৭৮
অমিত্রাক্ষর	দেবাশীষ মজুমদার	ভবেন্দু ভট্টাচার্য	১৯৭৯
শুকিয়ে যায় না			
সাজানো বাগান	-------	সুব্রত মজুমদার	১৯৮৩
মুচ্‌কিমঙ্গল কাব্য	রাধারমন ঘোষ	সুব্রত মজুমদার	১৯৮৫

রূপান্তরের অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - হারাণ মজুমদার, তেজস্‌কান্তি পঞ্চানন, স্বপন দে, নিমাই দাস,ভবেন্দু ভট্টাচার্য, মিলন চৌধুরী, পিন্টু সেন, প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী, লিলি পঞ্চানন, তপতী কুন্ডু, কল্পনা মাহাত, সুমনা দাস, সুব্রত মজুমদার,মৃদাঙ্ক সরকার, মলয় ভৌমিক প্রমুখ। আলোক সম্পাদে ছিলেন নিমাই দে।দৃশ্য সজ্জা ও মেক আপে ছিলেন নালু পাল, মন্টু অধিকারি, সুরঞ্জন দাস।

বালুরঘাট প্রগতি নাট্যসংস্থাঃ ১৯৭৭ সালে জুন মাসে বালুরঘাট 'প্রগতি নাট্যসংস্থা' গঠন হয়। নাট্যদলের কলাকুশলিরা সকলেই স্কুলে পড়ত। তাই তাঁদের নাট্য চিন্তাভাবনা ছিল স্কুল কেন্দ্রিক। পাড়ায় দুটো চৌকি লাগিয়ে ছোট্ট একটি মঞ্চ তৈরি করে তাঁদের নিজেদের লেখা নাটক, অশোক ভট্টাচার্যের 'বহ্নিপুরের রক্ত বহ্নি' প্রযোজনা হয়। শিশু নাট্য চিন্তা ভাবনার মধ্যে সেই সময় ভেসে ওঠে শোষক এবং শোষিতের কথা। নাটকের আলোর জন্য কোন স্পষ্ট ও ডিমার এর চিন্তা ভাবনা ছিল না। প্রগতি নাট্যসংস্থা মোট ১৪টি নাটক পরিবেশ করেছে। সমস্ত নাটক পরিচালনা করেছেন দুর্গাপদ সান্যাল।

১। 'বহ্নিপুরের রক্ত বহ্নি' নাটকে দেখানো হয়েছে জমিদার কীভাবে কৃষকদের উপর অত্যাচার করত। শোষক ও শাসিতের রূপটি নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন অশোক ভট্টাচার্য্য, সুশান্ত সান্যাল, দূর্গাপদ সান্যাল, শুভঙ্কর দে, তড়িৎ গুহ প্রমুখ।

২। ১৯৭৮ সালে জানুয়ারী মাসে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে প্রথম প্রগতির প্রযোজনায় মঞ্চায়ন হয়- শৈলেশ নিয়োগীর 'বেকারের স্বপ্ন'। বেকার ছেলেমেয়েদের অসহায় জীবন হল এই নাটকের মূল বিষয়। নাটকটিতে অভিনেতা হিসেবে ছিলেন দিলীপ কুন্ডু, সুশান্ত সান্যাল, মনোতোষ সাহা, শিবানী দে, নাটকটি মাত্র দুটি রজনী পরিবেশিত হয়েছিল।

৩। ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'দধিচী মন' নাটকটি (একাঙ্ক) মঞ্চস্থ হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কিভাবে খ্রীষ্টধর্ম যাজকরা অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের কচিকাচা শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মান্তর করার প্রচেষ্ঠা আর তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের জেহাদ ঘোষণা হল এই নাটকের মূল বিষয়। অভিনেতা হিসেবে ছিলেন মনতোষ সাহা, দুর্গাপদ সান্যাল, শুভঙ্কর দে, বাবলু রায়, কণক সাহা।

৪। ১৯৭৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বালুরঘাট প্রগতি নাট্য সংস্থার সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রযোজনা 'আজও প্রমিথিউস' শ্যামাকান্ত দাসের লেখা। জুলিয়াস সিজার ও তাঁর প্রিয় নারী ক্লিওপেটা কে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। অভিনেতা - মনতোষ সাহা, সুনীতি দাস, সুশান্ত সান্যাল, জগৎ পাল, প্রণব চক্রবর্ত্তী, বিমান চক্রবর্ত্তী, ক্লিওপেটার - এর ভুমিকায় সুনীতি দাস খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই নাটক পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মধ্যেই সেই সময়ে এক ও অদ্বিতীয় ছিল। নাটকটি ১৪ রজনী মঞ্চায়ন হয়।

৫। প্রবীর দাসের 'কমরেডস্ হাত নামান' খুব প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে অভিনীত হয় নাটকটি। সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির উপর ভিত্তি করে নাটকটি রচিত। দেশের শহীদের মর্যাদা না দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের নোংরা রাজনীতি এই নাটকের মূল বিষয়। কলাকুশলীদের মধ্যে ছিলেন - জগৎ রঞ্জন পাল, সুশান্ত সান্যাল, মনতোষ সাহা, সঞ্জিত ঘোষ, দিলীপ কুন্ডু, প্রণব মুখার্জী, সঞ্জয় দাস এবং মহিলা চরিত্রে ছিলেন মমতা দে ও মমতা সাহা। এই নাটকটি জেলা স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৬ বার পুরষ্কৃত হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে। নাটকটি ১১ রজনী মঞ্চায়ন হয়।

৬। ১৯৮০ সালেই প্রযোজিত হয় 'সমবেত সওয়াল জবাব' প্রবীর দত্তের লেখা। স্বার্থপর মানুষ গুলি শিশুদের কিনে নিয়ে তাদের খাওয়া পড়ার বিনিময়ে বিভিন্ন অপ্রিয় বৃত্তির কাজ করাতো। দিনের শেষে মালিককে উপার্জিত টাকা দিতে হত। এক সময় তারা আর এই অন্যায় মেনে নিতে না পেরে জবাব চাইতে শুরু করে। এটাই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন - জগৎ রঞ্জন পাল, সুশান্ত সান্যাল, মনতোষ সাহা, দিলীপ কুন্ডু, প্রণব মুখার্জী, সঞ্জয় দাস, মমতা দে, মমতা সাহা, সঞ্জিত ঘোষ, সুবাস বোস, শুভঙ্কর দে, তড়িৎ গুহ, দেবাশীষ ঘোষ। 'সমবেত সওয়াল জবাব' নাটকটি ৯ রজনী মঞ্চায়ন হয়। জেলাস্তরে দুইটি প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারী হয়েছিল।

১৯৮১ সালে বালুরঘাটে নাট্যজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় প্রগতি নাট্য সংস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ছিল প্রবীর দত্তের 'স্ফিংস', ইন্দ্রজিৎ সেনের 'গরম ভাত'। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্ধমানের বর বরিশালের কনে', শৈলেন নিয়োগীর 'ভূতের মুখে রামনাম'।
৭। মিশরের স্বৈরাচারী রাজা স্ফিংস এর পিরামিডকে অবলম্বন করে রচিত 'স্ফিংস' নাটক। পিরামিডের মধ্য দিয়ে শোষক ও শোষিতদের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন - দেবাশিস ঘোষ, মনতোষ সাহা, জগৎ পাল, সুশান্ত সান্যাল, দুর্গাপদ সান্যাল , নারু রায় / সঞ্জিত ঘোষ। 'স্ফিংস' প্রযোজনা হয় ২৯ রজনী। রায়গঞ্জ দেহশ্রী ব্যায়ামাগারে ১৯৮৫ সালে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'স্ফিংস' প্রথম স্থান ও শ্রেষ্ঠ পরিচালক (দুর্গাপদ সান্যাল) ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (দুর্গাপদ সান্যাল) পুরষ্কার পান। হাওড়া উলবেরিয়ায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ১৯৮৭ সালে ৬৫ টি নাটকের মধ্যে 'স্ফিংস' নাটকের অভিনয়ে পরিচালক দুর্গাপদ সান্যাল দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও পঞ্চম স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়।
৮। ১৯৮১ সালে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের 'গরম ভাত' ১২ রজনী অভিনীত হয়, গ্রামের পরিবেশের অন্ধকুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে 'গরমভাত' নাটকটি রচিত (নাট্যরূপ)। ভূতকে ধরতে পারলে গরমভাত পাওয়া যাবে এই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে দরিদ্র পরিবারের সন্তান নিজের পিতাকে মেরে গরম ভাত খাওয়ার চেষ্ঠা করেছে। অভিনেতা হিসেবে ছিলেন - প্রণব চক্রবর্ত্তী , দুর্গাপদ সান্যাল, প্রদীপ দাস, সুশান্ত সান্যাল প্রমুখ।
৯। 'বর্ধমানের বর বরিশালের কনে' নাটকটির নাটককার ও পরিচালক স্যবসাচী চট্টোপাধ্যায়। বিবাহ সংক্রান্ত হাস্যরসাত্মক এই নাটকটি ১৯৮১ সালে অভিনীত হয়। নাটকটি পাঁচ বার মঞ্চায়ন হয়। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন - স্বপন চক্রবর্ত্তী, মমতা দে, মমতা সাহা , প্রণব মুখার্জ্জী, দুর্গাপদ সান্যাল, প্রদীপ সাহা, সুশান্ত সান্যাল।
১০। 'ভূতের মুখে রামনাম' শৈলেশ নিয়োগীর লেখা হাস্যরসাত্মক নাটক। অভিনয় করেছিলেন

শঙ্কর কুন্ডু, সঞ্জিত ঘোষ, দেবাশীষ ঘোষ, দুর্গাপদ সান্যাল প্রমুখ। নাটকটি দশ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

এছাড়া ১৯৮৩ - ১৯৯০ সালের মধ্যে বালুরঘাট প্রগতি নাট্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় প্রযোজিত হয় মনোজ মিত্রের 'নৈশ ভোজ', ২১ রজনী, 'কিনু কাহারের থেটার', ১৩ রজনী এবং একাঙ্ক নাটক, 'একটি মন দুটি প্রাণ', 'ছাগল', (সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্প, নাট্যরূপ রজত চ্যাটার্জী)।

আত্রেয়ী নাট্যগোষ্ঠিঃ 'আত্রেয়ী নাট্যগোষ্ঠি' ১৯৭৮ সালে গঠিত হয় । আমবাগানের স্কুলে তাঁদের কার্যক্রম হত। বিপ্লব গোস্বামী ছিলেন আত্রেয়ী নাট্য গোষ্ঠির পরিচালক। এই সংস্থায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'কেনারাম বেচারাম', 'নরক গোলজার', 'দুর্গাবধ কাব্য' প্রভৃতি। অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - বিল্পব গোস্বামী, স্বপন সরকার, গীতা চৌধুরী, সমরেশ সরকার,মাধব সাহা, বুম্ব গুহ, বাবু মিত্র, উৎপল দাস, প্রদীপ মিত্র প্রমুখ।

নাট্যতীর্থঃ ব্যবহারিক জীবনে ভাঙ্গাগড়া যেমন একটা নিত্য খেলা তেমনি অন্য ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই ১৯০৯ সালে তৈরী 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' ভেঙ্গে আরো মন্দিরের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছে। এর অবশ্য ভাল বা মন্দ উভয় দিক আছে। নাট্য মন্দিরের বেশ কিছু অভিনেতা অভিনেত্রী, নাটককার মিলে গড়ে তোলেন 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯) নাট্য সংস্থ্যা। ত্রিতীর্থের সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গ নাট্যশিল্পের মানোৎকর্ষের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। মূল নাট্যগোষ্টির মধ্যে উপদলের সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তার, নেতৃত্বের সংঘাত ফলে নতুন দলের সৃষ্টি বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক চিরাচরিত প্রবণতা। তাই ত্রিতীর্থের প্রায় দেড় দশক পড়ে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির', 'অভিযাত্রী' বা অনান্য নাট্য সংস্থা থেকে আগত কিছু প্রতিভাবান কলাকুশলী গড়ে তোলেন 'বালুরঘাট নাট্যতীর্থ' (১৯৮২)। ১৯৮২ সালের ১৭ই অক্টোবর মোট ২৫ জন সদস্য দিয়ে নাট্যতীর্থ গড়ে ওঠে। নাট্য মন্দির থেকে উন্নত গুণমান ও নাট্যচর্চার আশায় গড়ে তোলেন বালুরঘাট 'নাট্যতীর্থ'। দেবল রায়, প্রণব চক্রবর্তী, দীপক রক্ষিত, আশিস রায়, অজয় সাহা, পরিতোষ দাস, শ্যামা প্রসাদ তলাপাত্র, দেবব্রত চক্রবর্তী, স্বপন নিয়োগী, মনি মোহন গুহবক্সী, সুখেন্দু চৌধুরী, শ্যামল চ্যাটার্জী, জীবেশ দাস, কালীকর, বাবু সরকার, বোধিসত্ব মজুমদার, স্বপন কুমার ঘোষ, অরুণ দত্ত, প্রসাদ সাহা, সান্তনু দাস, অনুপ রায়, অসিত রায়, জয়ন্ত বিশ্বাস, রীনা কর্মকার (প্রীতি)।

এই নাট্য সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল - ''আধারকে বড় না দেখে বিষয় কে বড় করে দেখা''[৩৬]। নাট্যতীর্থের প্রথমে কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিলনা। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় মহলা দিতেন। প্রথমে চকভৃগুতে, পরে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও হাইস্কুলের শিক্ষক পুলিন বিহারী দাশগুপ্তের শিব মন্দিরের চার চালাটিতে বাঁশের বেড়া দিয়ে অস্থায়ী মহলা কক্ষ বানিয়ে চর্চা চালান দুই বছর। নাট্যতীর্থ সংস্থা বহু দুর্যোগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। নাট্য কর্মীরা বুক ভরা ভালোবাসা দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য কাঁধে করে নাট্য চর্চার ক্ষেত্রে জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র ভবন সন্নিহিত ৫কাঠা জমি ২৫ টাকা খাজনার বিনিময়ে দেয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জেলা পরিষদ। প্রায় ৪০০ আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষা গৃহ গড়ে তুলেছে নাট্যতীর্থ।

নাট্যতীর্থ সৃষ্টি থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১৮টি নাটক প্রযোজনা করেছে। এর মধ্যে ৪টি একাঙ্ক ও ১৪টি পূর্নাঙ্গ। নাট্য তীর্থের প্রথম নাটক শ্যামলতনু দাশগুপ্তের একাঙ্ক 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মন্ডলের ঘর গেরস্তি' নাটকটির পরিচালক সুখেন্দু চৌধুরী। ১৯৮২ সালের ৯ই নভেম্বর পতিরামে মঞ্চায়িত হয়। নাটকটি পাঁচ রজনী অভিনীত হয়।

চরিত্র লিপিঃ

১) মতিশা – শ্রী সুখেন্দু চৌধুরী

২) সামশের – দীপক রক্ষিত

৩) পরাণ – সান্তনু দাস

৪) মুকুন্দ সর্দার – অজয় সাহা (হারু)

৫) হারাধন – আশিস রায়

৬) কালু সর্দার – তোতন দাস

৭) আলো – বোধিসত্ব মজুমদার,

৮) সংগীত – প্রণব চক্রবর্তী, সুব্রত চৌধুরী,

৯) মঞ্চ – স্বপন নিয়োগী, পবিত্র দে

নাটকটি কাটিহারে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ১৯৮৪ সালে ৮ই এপ্রিল অভিনীত হয় এবং পুরস্কৃত হয়।

শ্রেষ্ঠ চরিত্র – সুখেন্দু চৌধুরী (মতিশা)

তৃতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক – সুখেন্দু চৌধুরী

তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা – দীপক রক্ষিত (সামসের)

তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা।

দেবাশীষ মজুমদারের 'দানসাগর' নাটকটি ১৯৮২ সালে ১০ই নভেম্বর অভিনীত হয়। পরিচালক ছিলেন দীপক রক্ষিত। এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি মোট ঊনিশ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

চরিত্র লিপিঃ

ঘিসু – শ্রী শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র

মেধোর বৌ – শ্রীমতি রীনা কর্মকার

মেধো	–	শ্রী আশিষ রায়
নিতাই	–	শ্রী দেবব্রত চক্রবর্তী
গনেশ	–	শ্রী স্বপন নিয়োগী
কত্তাবাবু	–	শ্রী দেবল রায়
নোনা রায়	–	শ্রী অজয় সাহা
চোর	–	শ্রী সুখেন্দু চৌধুরী
নবকৃষ্ণ	–	শ্যামল চৌধুরী
চৌকিদার	–	শ্রী অসিত রায়
আলো	–	বোধিসত্ব মজুমদার
সংগীত	–	প্রণব চক্রবর্তী
মঞ্চ	–	স্বপন নিয়োগী, প্রসাদ সাহা, সান্তনু দাস

নাট্যমন্দির মঞ্চে অভিনীত নাটকটির সংগৃহীত অর্থ (১০১২.০০ টাকা) পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে দান করে।

১৯৮৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 'হাজার স্বপন' (একাঙ্ক) নাটকটি নাট্যমন্দির মঞ্চে মঞ্চস্থ করে নাট্যতীর্থ। পরিচালক সুখেন্দু চৌধুরী।

চরিত্র লিপিঃ

নগেন	–	শ্রী সুখেন্দু চৌধুরী
বনমালী	–	শ্রী অজয় সাহা
লালু	–	শ্রী রাজকুমার বসাক
তুলসী	–	শ্রীমতি রীনা কর্মকার

একই তারিখে শ্যামল সেনগুপ্তের একাঙ্ক নাটক 'হরেকৃষ্ণ' দীপক রক্ষীতের পরিচালনায় মঞ্চায়িত হয়।

চরিত্র লিপিঃ

ষষ্ঠী	–	শ্রী অসিত রায়

প্রহ্লাদ – শ্রী শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র

মুকুন্দ – শ্রী আশিষ রায়

সুবল – শ্রী দীপক রক্ষীত

আলো – বোধিসত্ব মজুমদার

সংগীত – প্রণব চক্রবর্তী

মঞ্চ – স্বপন নিয়োগী, অজয় সাহা, সান্তনু দাস, সুব্রত চৌধুরী, তাপস সাহা

'হাজার স্বপন' ও 'হরেকৃষ্ণ' নাটক দুটি মালদা 'রূপরঙ্গম' আয়োজিত নাট্যৎসবেও অভিনীত হয়েছে।

১৯৮৩ সালের ৬ই জুলাই নাট্যতীর্থ প্রযোজিত, পরিতোষ দাসের পরিচালনায় শ্যামল সেন গুপ্তের নাটক 'কালাবদর' বহু প্রসংশালাভ করে। নাটকটি ১৯৮৪ সালের ২রা ফ্রেব্রুয়ারী পাটনা শিল্পীসমিতি আয়োজিত 'সর্ব ভারতীয় বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা' -য় অভিনেত্রী স্মৃতিকণা দাস শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত এবং পুরস্কৃত হন।

চরিত্র লিপিঃ

ভূষণ – দেবল রায়

সাধু – সুখেন্দু চৌধুরী

নিমাই – শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র

ইন্দ্র – শ্রী পরিতোষ দাস

পুটু – শ্রী দীপক রক্ষীত

দত্ত বাবু – শ্রী শ্যামল চ্যাটার্জী

কুন্ডু বাবু – শ্রী দেবব্রত চ্যাটার্জী

দুর্গা – শ্রীমতী স্মৃতিকণা দাস (সোনা)

এছাড়াও উদ্বাস্তু চিত্র ফুটিয়ে তুলতে বহু অভিনেতা ছিলেন। নাটকটি ২৫ রজনী অভিনীত হয়েছে।

কাউন্টার – কালীকর

আলো – বোধিসত্ব মজুমদার

সঙ্গীত – প্রণব চক্রবর্তী

মঞ্চ – পরিতোষ দাস, সুব্রত চৌধুরী, স্বপন নিয়োগী, দীপক রক্ষিত

প্রেক্ষা গৃহ – গৌতম সরকার, বৈদ্যনাথ দাস, বিপ্লব চক্রবর্তী, স্বপন ঘোষ

শ্যামল সেনগুপ্তের 'কানামামা' নাটকটি দীপক রক্ষীত –এর পরিচালনায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৯৮৪ সালে ৪ঠা মে তারিখে নাট্যমন্দির মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়।

'কানামামা' মোট ১৪ রজনী প্রদর্শিত হয়েছিল।

চরিত্রলিপিঃ

ইন্দ্রজীৎ	–	শ্রী গৌতম সরকার
কানামামা	–	শ্রী শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
মদন জানা	–	শ্রী দীপক রক্ষীত
শশধর	–	শ্রী শ্যামল তলাপাত্র
বনমালী	–	শ্রী দেবল রায়
যুবক	–	শ্রী অজয় সাহা
জীবন	–	গৌতম দাসগুপ্ত
মিসেস ললিতা	–	স্মৃতিকণা দাস
সুখদা	–	বেবী দাস
বিলাসী	–	ববী চক্রবর্তী
সুখদার স্বামী	–	সুব্রত চৌধুরী
পুলিশ	–	সুখেন্দু চৌধুরী
শ্রমিক গণ	–	বহু অভিনেতা
আলো	–	বোধিসত্ব মজুমদার
সংগীত	–	প্রণব চক্রবর্তী, সুব্রত চৌধুরী
মঞ্চ	–	সুখেন্দু চৌধুরী, প্রণব চক্রবর্তী, স্বপন নিয়োগী, পরিতোষ দাস

প্রেক্ষাগৃহ	–	পবিত্র দে, আশিস রায়, দেবব্রত চক্রবর্তী,
		জীবেশ দাস, স্বপন ঘোষ, স্বপন নিয়োগী

'কানামামা' নাটকটি শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী মঞ্চে (১৯৮৬ সালে ২০ ও ২১ এপ্রিল) সুনামের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

নাট্যতীর্থ প্রযোজিত বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকটি পরিচালক দীপক রক্ষিত। নাটকটি মোট ১৬ রজনী অভিনীত হয়েছে।

চরিত্র লিপিঃ

ছকড়ি দত্ত	–	শ্যামল চ্যাটার্জ্জী
নকড়ি দত্ত	–	দেবল রায়
বাঞ্ছারাম	–	শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
গুপি	–	শান্তনু দাস
মোক্তার	–	আশিস রায়
গোবিন্দ ডাক্তার	–	দীপক রক্ষিত
হোৎকা ও কোৎকা (যমজ)	–	গৌতম সরকার
চোর	–	সুখেন্দু চৌধুরী
গনৎকার	–	অজয় সাহা
পুরোহিত	–	দেবব্রত চক্রবর্তী
গোবিন্দ	–	স্বপন নিয়োগী
পদ্ম	–	শ্রাবণী রায় (বুলবুল)
নকড়ী গিন্নি	–	রীনা কর্মকার
সংগীত	–	প্রণব চক্রবর্তী
আলো	–	বোধিসত্ত্ব মজুমদার
মঞ্চ	–	সুখেন্দু চৌধুরী, বাদল দত্ত, সুব্রত চৌধুরী

শ্মশান যাত্রী হিসাবে বহু অভিনেতা ছিলেন। 'সাজানো বাগান' নাটকটি ১৯৮৬ সালের ২৩শে মার্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মঞ্চায়িত হয়। ১৯৮৬ সালে ৫-ই এপ্রিল নাট্যতীর্থ প্রযোজিত নাটক হল 'জীবন দর্পন'। নাটকটি মোট ১২ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

শ্যামল সেনগুপ্তের 'রবিমীনে' নাটকটি ১৭-ই আগষ্ট ১৯৮৬ সালে নাট্যতীর্থের প্রযোজনায় মঞ্চায়িত হয়। পরিচালক দীপক রক্ষীত।

চরিত্র লিপিঃ

মুকুন্দ দত্ত	-	দীপক রক্ষীত
কুঞ্জ	-	দেবব্রত চক্রবর্তী
হারাণ	-	স্বপন নিয়োগী
ষষ্ঠী	-	সুখেন্দু চৌধুরী
প্রহ্লাদ	-	শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
সুবল	-	গৌতম সরকার
গিন্নি	-	শ্রীমতি রীনা কর্মকার
মুক্তো	-	মিলন সরকার
আলো	-	বোধিসত্ব মজুমদার, নিমাই দে
সংগীত	-	প্রণব চক্রবর্তী
স্মারক	-	পবিত্র দে
রূপসজ্জা	-	মন্টু অধিকারী
গেট ও প্রেক্ষাগৃহ	-	অরুণ দত্ত, আশিষ রায়, দেবল রায়, মনিমোহন গুহবকসী, স্বপন বনিক, সুব্রত চৌধুরী, জয়ন্ত চক্রবর্তী।

'রবিমিনে' নাটকটি মাত্র ২ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

১৯.১২.১৯৮৮ সালে ক্রিস্টোফার মার্লো রূপান্তরিত নাটক 'ডঃ ফস্টাস' নাটকটি নাট্যতীর্থের প্রযোজনায় নাট্যমন্দির মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি রূপান্তর করেন আবদুল্লাহ আল মামুন। পরিচালক দ্বয় - পরিতোষ দাস ও প্রণব চক্রবর্তী।

চরিত্র লিপিঃ

ডঃ ফস্টার	-	সুনীল খাঁ

ডালডেস	–	পরিতোষ দাস
ওয়েগানার	–	স্বপন বনিক
১- জ্ঞানী	–	সুখেন্দু চৌধুরী
২-য় জ্ঞানী	–	দেবব্রত চক্রবর্তী
বৃদ্ধ	–	অজয় সাহা
লুমিকার	–	দেবল রায়
সেফিস্টোফিলিস	–	শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
পোপ	–	প্রণব চক্রবর্তী
১ম যাজক	–	স্বপন ঘোষ
২য় যাজক	–	বাদল দত্ত
সম্রাট	–	বাসব দত্ত
সম্রাজ্ঞী	–	শ্রীমতি মিলন সরকার
হেলেন	–	শুচিস্মিতা কুন্ডু
থাইস	–	শুক্লা রক্ষিত
নাইট	–	গৌতম সরকার
আলেকজান্ডার	–	শ্রী দীপক রক্ষিত
সিক্টার	–	অমিতাভ চক্রবর্তী
আলো	–	বোধী সত্ব মজুমদার
সংগীত	–	প্রণব চক্রবর্তী
সহযোগী	–	সত্যব্রত দাশগুপ্ত
মঞ্চ	–	দীপক রক্ষিত

নাটকটি মোট ৮ রজনী অভিনীত হয়েছে।

২৮.০৩.১৯৯০ তারিখে প্রণব চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অভিনীত হয় গিরীশ ঘোষের ‘য্যায়সা কা ত্যায়সা’।

চরিত্রলিপিঃ

হারাধন	–	শ্রী দেবল রায়
মানিক	–	স্বপন ঘোষ
গরব	–	শ্রীমতি মিলন রায়
রতন	–	শ্রীমতি শুচিস্মিতা কুন্ডু
সনাতন	–	প্রভাস সরকার
রসিক মোহন	–	শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
জহুরী	–	পরিতোষ দাস
পোষাকওয়ালা	–	সুব্রত চৌধুরী
হাকিম	–	অরুণ দত্ত
বৈদ্য	–	স্বপন ঘোষ
হোমিওপ্যাথ	–	সুখেন্দু চৌধুরী
ডঃ ঢেলি	–	অজয় সাহা
ডঃ নন্দী	–	সুনীল খাঁ
বাদ্যকার	–	দেবব্রত চক্রবর্তী
আলো	–	নিমাই দে
সঙ্গীত	–	প্রণব চক্রবর্তী
সঙ্গীত সহযোগী	–	সত্যব্রত দাশগুপ্ত

এছাড়াও বেশ কয়েকজন অভিনেতা ছিলেন। নাটকটি ৫ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

দিবেন্দু পালিতের ছোট গল্প ‘মধ্যমনি’ গল্পের নাট্যরূপ দেন রজত চক্রবর্তী। ‘মধ্যমনি’ নাটকটি প্রণব চক্রবর্তীর পরিচালনায় ১৮.০১.১৯৯৩ তারিখে অভিনীত হয়। নাটকটি ৫ রজনী অভিনীত হয়।

চরিত্র লিপিঃ

আনন্দ বাবু	–	শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
রমেন	–	পরিতোষ দাস

টোটো	–	অজয় সাহা
সুদেব	–	গৌতম সরকার / সুবীর চৌধুরী
বটু বাবু	–	দেবল রায়
নিমুদা	–	দেবব্রত চক্রবর্তী
১ম যুবক	–	বাপ্পা রায়
২য় যুবক	–	স্বপন বনিক
৩য় যুবক	–	স্বপন নিয়োগী
মধু	–	পুলক মজুমদার
দোলন	–	শ্রীমতি মৌসুমী গোস্বামী
সীমা	–	সুপ্রিয়া সরকার
মঞ্চ ও আবহ	–	প্রণব চক্রবর্তী
সহকারী	–	স্বপন বনিক, মনিমোহন গুহবক্সী

নাটকটি পাঁচ রজনী অভিনীত হয়।

শ্যামল সেনগুপ্তের নাটক 'মহাযুদ্ধ' ২২.১২.১৯৯৩ তারিখে দীপক রক্ষিতের পরিচালনায় অভিনীত হয়। নাটকটির চরিত্র সংখ্যা এতবেশী ছিল যে নাট্যতীর্থের প্রায় প্রতিটি সদস্য অভিনয় করেছিল। নাটকটি ৩ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

অসিম রায়ের গল্প অবলম্বনে দেব কুমার ভট্যাচার্য – এর নাট্যরূপ 'ধূঁয়ো ধূলো নক্ষত্র' অভিনীত হয় ১০ই আগষ্ট ১৯৯৬ সালে। পরিচালক প্রণব চক্রবর্তী। নাটকটি মোট ২ রজনী প্রদর্শিত হয়েছিল।

চরিত্র লিপিঃ

রতন	–	বাপ্পা সরকার
অধীর চ্যাটার্জী	–	দেবব্রত চক্রবর্তী
ওসি	–	সুখেন্দু চৌধুরী
বেনু	–	উৎপল মজুমদার
রামকৃষ্ণ	–	অজয় সাহা

মা	–	প্রীতি সরকার
দীপ্তি	–	সংগীতা ঘোষ
আলো	–	নিমাই দে
মঞ্চ	–	স্বপন বনিক
সংগীত	–	প্রণব চক্রবর্তী

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় – এর নাটক 'খারিজ' প্রণব চক্রবর্তীর নিয়ন্ত্রণে ৫০ রজনী অভিনীত হয়েছে। নাটকটির প্রযোজনা করা হয়েছিল প্রশিক্ষণ ভিত্তিক হিসাবে।

চরিত্রলিপিঃ

বনমালী	–	অজয় সাহা
নগেন	–	সুখেন্দু চৌধুরী
মকবুল	–	শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র
বিনোদ	–	উৎপল মজুমদার
ঘনশ্যাম	–	স্বপন ঘোষ
সুবল	–	দেবব্রত চক্রবর্তী
সুধীর	–	স্বপন সরকার
কালু	–	মাধব কৌশিক সরকার
সুরবালা	–	শ্রী মতি ববি চক্রবর্তী
তুলসী	–	শেফালী চন্দ
ভামনী	–	প্রীতি সরকার

অন্যান্য চরিত্রে আরো দশজন অভিনেতা ছিলেন।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রূপোর হরিণ' নাটকটি ১৮ই ডিসেম্বর ২০০০ সালে অভিনীত হয়। পরিচালক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র। 'রূপোর হরিণ' নাটকটি ৪ রজনী অভিনীত হয়েছে।

সমাজ সচেতনমূলক নাটক 'সুখ ও শান্তি' ১৫ রজনী প্রদর্শিত হয়েছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সুন্দর' নাটকটি ১৭ই অক্টোবর ২০০৭ সালে অভিনীত হয়। পরিচালনা করেছেন প্রণব চক্রবর্তী। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা দত্ত, অজয় সাহা, দেবব্রত চক্রবর্তী, শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র, বাপ্পা সরকার, রাম ঘোষ, শেফালী চন্দ। নাট্যতীর্থের নিজস্ব মঞ্চ তৈরীর পূর্বে প্রায় সমস্ত নাটক নাট্য মন্দিরে অভিনীত হয়েছে।

নাট্যতীর্থের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ ১৯৮৩ সালে নভেম্বর মাসে নাটককার ড. মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' প্রথম একাঙ্ক নাটককে কেন্দ্র করে 'একাঙ্ক নাটকের হীরক জয়ন্তী উৎসব' পালন করে তিন দিন ধরে নাট্যতীর্থ। ত্রিতীর্থ এই মহতি উৎসবের জন্য তাদের মঞ্চ ব্যবহার করার অনুমতি দেয় নিখরচায়। এতে কলকাতার 'চেতনা', সোদপুরের 'ক্রান্তিকাল' 'নাট্যতীর্থ' সহ মোট ১০টি নাট্যদল অংশ নেয়। নাট্যতীর্থ ১৯৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর সারাদিন নাটক অনুষ্ঠান করে।

সকাল ৯.৩০ মিঃ	-	কালাবদর
দুপুর ৩টা	-	দান সাগর
সন্ধ্যা ৭টা	-	কানামামা

উক্ত তিনটি নাটক একই দিনে মঞ্চস্থ করা প্রকৃত অর্থেই পরীক্ষা মূলক একটি ব্যতিক্রম প্রচেষ্টা। ১৯৮৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী দুপুর ২.৪৫ মিনিটে আকাশবাণী শিলিগুড়ি থেকে নাট্যতীর্থের 'কালাবদর' নাটকটির সম্প্রচার হয়। প্রযোজনায় ছিলেন আকাশবাণীর শ্রী অমল মন্ডল। ১৯৮৮ সালের ৯ই অক্টোবর বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে 'কানামামা' নাটক মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে সংগৃহিত ১৫০০.০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে জমা দেওয়া হয়।

নাট্যতীর্থ মনে করে নৃত্য-সংগীত-নাট্য-একই সাংস্কৃতিক ধরার অর্ন্তভূক্ত। কোনো নাট্যসংস্থ্যা একই সঙ্গে সময় ও সুযোগের সদব্যবহার করে নৃত্য ও সংগীতের চর্চাতেও আত্মনিয়োগ করতে পারে নাট্যতীর্থই তা প্রথম দেখাল। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে নাট্যতীর্থের ব্যবস্থাপনায় সারারাত উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ওড়িশী নৃত্য শিল্পী বিশ্বখ্যাত সংযুক্তা পানিগ্রাহী, কলকাতার তবলা বাদক শ্যামল বোস, কন্ঠ শিল্পী তনিমা ঠাকুর, পন্ডিত ভি.জি. যোগ (বেহালা) প্রমুখ শিল্পী বৃন্দের আগমন হয়। ১৯৯১ এর জানুয়ারী মাসে কলকাতার আই.টি.সি. এর সহযোগিতায় সারারাত উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অংশ নিয়েছিলেন জাকীর হোসেন, হরপ্রসাদ চোড়াশিয়া, বিজয় কিচলু, পঃ ভি. জি. যোগ, মসকুর আলি, সমীর চ্যাটার্জী, পঃ অজয় চক্রবর্তী প্রমুখ বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। নাট্যতীর্থ ১৯৮৬ সালে ডিসেম্বরে 'নাট্যতীর্থ নাটোৎসব ৮৬' শিরোনামে ৭দিনের বিশাল নাট্যোৎসবর আয়োজন করে। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত নাট্যদলকে আমন্ত্রণ করেছেন। এতে বালুরঘাটের দর্শকেরা কলকাতার ও মফ:স্বলের কয়েকটি ভালো নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছে।

নাট্যতীর্থ সরকারী নির্দেশানুসারে খুব স্বল্প খরচে সমাজসচেতন মূলক নাটক গ্রামে গঞ্জেপরিবেশন করে থাকে। এই মহৎ কাজটি নাট্যতীর্থ করেছে। নাট্য মাধ্যমকে সবল ও

সচল রাখতে এঁরা সব সময়ই প্রস্তুত। নাট্যতীর্থ তৈরী মঞ্চটি নাটককার মন্মথ রায়ের জন্মশতবর্ষে মন্মথ রায়ের নামে 'মন্মথ মঞ্চ' নামে উৎসর্গ করেছে।

পদাতিক নাট্যসংস্থা:

ক্ষণ আয়ু নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৮৫ সালে 'পদাতিক নাট্য সংস্থা'। সমরেন্দ্র সরকারের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে পদাতিক। সমরেন্দ্র সরকার সমস্ত নাটক পরিচালনা করেন। পদাতিক নাট্যসংস্থার উল্লেখযোগ্য নাটক 'গাব্বু খেলা', 'যোগিনী যখন যজ্ঞেশ্বর' অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাপি রুদ্র, প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী, বিপ্লব চৌধুরী, শান্ত দত্ত, দেবাশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বালুরঘাট নাট্যকর্মীঃ তূণীর এর নাট্যকর্মীদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব এর ফলে প্রদোষ মিত্র তূণীর ত্যাগ করেন এবং গড়ে তোলেন 'বালুরঘাট নাট্যকর্মী' নাট্যসংস্থা (১৯৯৩)। 'বালুরঘাট নাট্যকর্মী' - র পথ চলা শুরু হয় আলবেয়ারকাম্যুর ''The Just'' অবলম্বনে সুব্রত নন্দীর লেখা 'ন্যায়' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে ১৯৯৩ সালের ১১ই অক্টোবর বালুরঘাট নাট্যকর্মীর প্রতিষ্ঠা দিবসে। নাটকটি পরিচালনা করেন প্রদোষ মিত্র। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে। উক্ত নাটকে অভিনয় করেছিলেন প্রাণতোষ ভট্টাচার্য, পাপিয়া সরকার, দেবতোষ ভট্টাচার্য, রক্তিম সাহা, প্রদোষ মিত্র। নাটকটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নাটকটি লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত 'সারা ভারত বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায়' (১৯৯৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী) পুরস্কৃত হয়। তিনটি পুরস্কার পায় বালুরঘাট নাট্যকর্মী-১. দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ২. দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-ধ্রুব মুখার্জী ৩. শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী-পাপিয়া সরকার।

কিন্তু যে নাটকটি বালুরঘাট নাট্যকর্মীর প্রযোজনায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে সেটি 'সানাই'। 'সানাই' - এর কাহিনী প্রদোষ মিত্রের এবং নাট্যরূপ ভাস্কর চ্যাটার্জীর। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই প্রথম আটবছরের একটি শিশু একক অভিনয় করে। 'সানাই' এর প্রথম অভিনয় তারিখ ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ। নাটকটি অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। নাটকটি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি নান্দীকারের জাতীয় নাট্যমেলা, কল্যানী জাতীয় মেলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে অভিনীত হয়। এই নাটকটি বোম্বে চার রজনী অভিনীত হয়। রাইনূপুর মিত্র শিশু শিল্পি হিসাবে নাটকটিতে অভিনয় করেছেন। রাইনূপুর মিত্র এই নাটকের সুবাদে 'নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম' পুরস্কারে পুরষ্কৃত হয়। দেড় বছরে ২৮ বার অভিনয় হয়। বালুরঘাটের নাট্যজগতে ত্রিতীর্থের 'দেবাংশী'-র পর 'সানাই' একটা মাইলস্টোন। 'সানাই' নাটককে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরে ১৯৯৭ সালের ৬ই ফ্রেব্রুয়ারী একটি আলোচনা সভাও হয়েছিল।

'সানাই' এই পর ২০০২ সালের ৮ই নভেম্বর বালুরঘাট নাট্যকর্মীর প্রযোজনায় মঞ্চায়ন হয় 'The Just'। এই নাটকের জন্য পরিচালক প্রদোষ মিত্র 'উত্তরবঙ্গ নাট্য জগত' পুরস্কার পান ২০০৩ সালে। ২০০৩ সালে প্রযোজিত হয় ব্রেখট এর নাটক 'Exception & Rules' অবলম্বনে রচিত 'নিয়ম ও ব্যতিক্রম'। এই নাটকটির অভিনয় চার রজনী হয়েছিল। ২০০৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর শৈলেশ গুহ নিয়োগী-র 'ঝুমুর' অভিনীত হয়। এরপর বালুরঘাট নাট্যকর্মী সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধের কারণে প্রদোষ মিত্র বেরিয়ে আসার পর দলের দায়িত্ব নেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য মহাশয়। বালুরঘাট নাট্যকর্মীর প্রযোজনায় ২০০৫ সালে

'আলকায়দা' (মূল কাহিনী অশোক গোস্বামী, নাট্যরূপ ভাস্কর চ্যাটার্জ্জী) রক্তিম সাহার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। এর পর বালুরঘাট নাট্যকর্মী কিছুদিন নীরব থাকার পর আবার নাটক পরিবেশন করছে।

দর্পণ নাট্য সংস্থাঃ পার্থ মজুমদার, পার্থ দাস, বাবলু সরকার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, প্রীতম সরকার, প্রসেনজিৎ ঘোষ, প্রদীপ মান্না প্রমুখকে নিয়ে মনোজ গাঙ্গুলী গড়ে তোলেন দর্পণ নাট্য সংস্থা, সময় ১৯৯২ সাল। ১৯৯৩ সালে দর্পণের প্রথম নাটক রতন কুমার ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে'। সমস্থ নাটক পরিচালনা করেন অভিনেতা নাটককার মনোজ গাঙ্গুলী। 'দর্পণ' প্রযোজিত নাটক গুলি হল-

লাটা খাম্বা	–	১৯৯৪
সিতার অগ্নিপরীক্ষা	–	১৯৯৫
বিরিঞ্চি বাবা	–	১৯৯৫
পদধ্বনি	–	১৯৯৬
ঠগ	–	২০০২
অসুখ	–	২০০৩
সেঁয়াস অধিবেশন	–	২০০৩

'দর্পণ' প্রযোজিত কয়েকটি নাটকের চরিত্র লিপি দেওয়া হল-

নাটক-সমুদ্রসন্ধানে

নাটককার	–	রতন ঘোষ
পরিচালক	–	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
সময়	–	১৯৯৩
আবহসঙ্গীত	–	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
আলো	–	নিমাই দে
অভিনয় রজনী	–	আট

চরিত্র লিপি

দশরথ মাঝি	–	সন্দীপ মন্ডল
অভিমুন্য	–	প্রদীপ মান্না
চন্দর	–	প্রসেনজিৎ ঘোষ
সুনীল	–	বিভাস দাস
নকুল	–	বিকাশ দাস
ভাড়াটিয়া খুনি	–	বাবলু সরকার
বাইজী	–	তনু দেব

এছাড়াও ছিলেন তারকনাথ অধিকারী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও আশিষ সাহা।

নাটক - লাটা খাম্বা

নাটককার	-	স্বপ্নময় ঘোষ
পরিচালক	-	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
সময়	-	১৯৯৪
আবহসঙ্গীত	-	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
আলো	-	নিমাই দে
অভিনয় রজনী	-	সাত

চরিত্র লিপি

সিউ প্রসাদ	-	প্রসেনজিৎ ঘোষ
লাছিয়া	-	কস্তুরী দত্ত
মহান্ত মহারাজ	-	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
ইন্সপেক্টর	-	জয়ন্ত ভট্টাচার্য
মামিন	-	সীমা সরকার
বিপ্লবী	-	প্রদীপ মান্না
বৃদ্ধ	-	পার্থ মজুমদার
দেবী সিং	-	দুর্গাপদ সান্যাল
দাই	-	বাবলু সরকার
পাহাড়দার	-	অমিত দাস

নাটক-বিরিঞ্চিবাবা

মূল গল্প	-	পরশুরাম
নাট্যরূপ	-	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
সময়	-	১৯৯৫
আবহসঙ্গীত	-	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
আলো	-	নিমাই দে
অভিনয় রজনী	-	পাঁচ

চরিত্র লিপি

বিরিঞ্চিবাবা	-	পার্থ মজুমদার
বিরিঞ্চি বাবুর ছেলে	-	বিশ্বজিৎ ঘোষ
নিবারণ	-	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
সত্যব্রত	-	প্রসেনজিৎ ঘোষ
হরিপদ বাবু	-	মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী
গণেশ মামা	-	সমীর ভট্টাচার্য
নিতাই দা	-	দুর্গাপদ সান্যাল
পরমার্থ	-	প্রদীপ মান্না
প্রফেসর ননী	-	মালয় দাস
বুচকি	-	কল্পনা ঘোষ

প্রফেসরের স্ত্রী – মিলি বিশ্বাস

নাটক – সীতার অগ্নি পরীক্ষা

পরিচালক – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
সময় – ১৯৯৫
আবহসঙ্গীত – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
আলো – নিমাই দে
অভিনয় রজনী – তিন

চরিত্র লিপি

সীতা – কস্তুরী দত্ত
রাম – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
লক্ষ্মণ – প্রদীপ মান্না
হনুমান – পার্থ মজুমদার
জাম্বুবান – প্রসেনজিৎ ঘোষ
প্রহরী – রূপক সেন

এছাড়াও ছিলেন অমিত দাস, তারকনাথ অধিকারী

নাটক – ঠগ্

নাটককার – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালক – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
সময় – ২০০২
আবহসঙ্গীত – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
আলো – নিমাই দে
অভিনয় রজনী – দুই

চরিত্র লিপি

তারাপদ – প্রসেনজিৎ ঘোষ
বামাপদ – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
মেয়েটি – শ্রীতমা দেব
মেয়েটির বাবা – পার্থ মজুমদার
ছেলেটি – প্রীতম সরকার
চাকর – তারক অধিকারী

এছাড়াও ছিলেন- সমীর ভট্টাচার্য ,পার্থ দাস, অমিত দাস, দুর্গাপদ সান্যাল, বাবাই সরকার, রাম ঘোষ, সুকমল ঘোষ

নাটক – সেঁয়াস অধিবেশ

মূল গল্প – পরশুরামের ‘রামরাজ্য’
নাট্যরূপ – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালক – মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
সময় – ২০০৩

আলো	–	নিমাই দে
আবহসঙ্গীত	–	অমিত দাস
অভিনয় রজনী	–	এক

চরিত্র লিপি

সুবোধ রায়	–	দুর্গাপদ সান্যাল
কানাই গঙ্গোপাধ্যায়	–	প্রসেনজিৎ ঘোষ
হরিপদ কবিরত্ন	–	সমীর ভট্টাচার্য
বিপাসা	–	দেবযানী গঙ্গোপাধ্যায়
ভূজাঙ্গভঞ্জ	–	বাবাই সরকার
গনেশ	–	তারকনাথ অধিকারী
ভূতনাথ	–	মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়
অবধ বিহারী লাল	–	প্রীতম সরকার

একটি বিশেষ কারণে প্রথম রজনীর পরে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মী

প্রদোষ মিত্র বালুঘাট নাট্যকর্মী থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন দল গঠন করলেন 'বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মী' নামে। বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মীর প্রথম প্রযোজনা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'এক দুই' (২০০৬ সালের ২০শে জুলাই)। নাট্যরূপ ও পরিচালনা প্রদোষ মিত্র। নাটকটি ৬-৭ রজনী অভিনীত হয়। 'এক দুই' নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন শুভব্রত রায়, অভিষেক মিত্র, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সুকন্যা সরকার, বেবি সাহা, রত্না সোম, দিলীপ সাহা, অভিজিৎ চ্যাটার্জী প্রমুখ।

বালুরঘাট সৃজন নাট্যগোষ্ঠীঃ

কলকাতায় যখন অনুনাটক শুরু হয় তখন থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহা কলকাতা অনুনাটক দেখতেন। সেই সময় থেকে তাঁর অনুনাটক ভালো লাগতো। এক মঞ্চে এক সন্ধ্যায় বহু নাটক অভিনীত হতে পারে। বিভিন্ন স্বাদের নাটকের অভিনয় দর্শক একই সময় দেখতে পায়। তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং ২০০৮ সালে 'বালুরঘাট সৃজন নাট্যগোষ্ঠী' (Regd. No S/2L/34404) তৈরী করেন যার পথচলা শুরু হয়েছিল চারটি অনুনাটক নিয়ে। ময়ূখ নাট্যগোষ্ঠীর 'কাল বা পরশু', 'আসমান ফরসা তো মন ফরসা', সৃজনের 'বারাণসী' এবং শপথ শাখার 'জ্বর'। উত্তরবঙ্গে প্রথম অনুনাটক সংস্থা হল সৃজন নাট্যগোষ্ঠী তারপর জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে অনুনাটক শুরু হয়।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ

১৯৪৩ সালের ২৫শে মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর স্মরণীয় ঘটনা। একই সঙ্ঘের মঞ্চ থেকে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের শিল্পীরা বিভিন্ন ভাষায় লোক সঙ্গীতের, লোক নাট্যের এবং নানা রকমের লোক নৃত্যের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের পরম্পরাগত শিল্পী শৈলী

যেমন প্রতিফলিত করলেন তেমনি তাঁদের বেদনা ও বঞ্চনাকে এবং ক্ষীয়মান আশাকেও প্রকাশের অবকাশ করে দিলেন। পৃথিবীর জনচেতনার বাণীও তাঁরা পৌঁছে দিলেন ভারতীয় নিরক্ষরদের কুটীরে কুটীরে। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বালুরঘাটেও গণনাট্যের শাখা প্রসারিত হয়েছিল, দুটি শাখা গঠিত হয়েছিল-

১. ভারতীয় গণনাট্যের বালুরঘাট শাখা (১৯৮২)।
২. ভারতীয় গণনাট্যের শপথ শাখা (২০০৫)।

১. ভারতীয় গণনাট্যের বালুরঘাট শাখা (১৯৮২)ঃ ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বালুরঘাট শাখা' প্রতিষ্ঠা হয়।ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বালুরঘাট শাখার প্রথম নাটক 'ভোট এড়াতে কোর্টে' চল (১৯৮২)। নাটকটি ছিল পথ নাটক। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বালুরঘাট শাখার প্রথম সম্পাদক কিশান মজুমদার। এই সংস্থার সমস্থ নাটকই প্রচার মূলক, উদ্দেশ্যধর্মী। ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ টি প্রোসেনিয়াম নাটক ও ১৯ টি পথ নাটক পরিবেশন করেছে। প্রোসেনিয়াম নাটকের মধ্যে ১৪ টি একাঙ্ক , ৩ টি পূর্ণাঙ্গ নাটক।

১। ১৯৮২ সালে সুকমল নাথের পরিচালনায় শ্রীজীব গোস্বামী এর লেখা 'গায়েন' নাটকটি মঞ্চায়িত হয়।তৎকালীন পিছিয়ে পড়া গ্রামের মানুষের সঠিক রাস্তা দেখানো ,সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই হল নাটকের মূল বিষয়। নাটকটি মোট ১৪ রজনী অভিনীত হয়েছিল।

অভিনেতা / অভিনেত্রী: অরিন্দম চক্রবর্তী,প্রশান্ত মৈত্র, চন্দন দাস, সুকমল নাথ, বাদল মজুমদার,। ৮ রজনী অভিনীত হয় নাটকটি।

২। 'শপথ' সুকমল নাথের লেখা সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রচার মূলক নাটক, নাটককার স্বয়ং নাটকটি পরিচালনা করেছেন। অভিনয় করেছেন-অরিন্দম চক্রবর্তী, প্রশান্ত মৈত্র, চন্দন দাস, সুকমল নাথ, বাদল মজুমদার। মোট ৮ রজনী অভিনীত হয় নাটকটি।

৩। শুভেন্দু মাইতির 'ভূত' নাটকের বিষয় হল গ্রামের জোতদার জমিদারের হাত থেকে সাধারণ মানুষের জমি উদ্ধারের কাহিনি। নাটকটি ১৯৮৪ সালে বালুরঘাট শাখার প্রযোজনায় অভিনীত হয় নাটকটি জনপ্রিয় হয়েছিল। মোট ছত্রিশ রজনী অভিনীত হয়েছিল। 'বালুরঘাট পৌরসভার পঁয়ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং বর্তমান পরিচালক মন্ডলীর চতুর্থ বর্ষপূর্তি উৎসব ১৮-২১ জুন ১৯৮৫' উপলক্ষে স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক প্রতিযোগিতায় 'ভুত' নাটকটি শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ পরিচালক সমরেন্দ্র সরকার, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চন্দন দাস, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অরিন্দম চক্রবর্তী পুরস্কৃত হন।

অভিনেতা/অভিনেত্রী : সমরেন্দ্র সরকার, প্রশান্ত মৈত্র, অরিন্দম চক্রবর্তী, চন্দন দাস, মানস দত্ত, শিবাশীষ চক্রবর্তী, মাধব সাহা, শম্ভু মহন্ত প্রমুখ।

৪। 'ঝটিতি বিচার' নাটকটি শান্তনু দাসের লেখা। INF থেকে তৎকালীন সরকার যে ঋণ দিত তার যে কুফল সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা এ নাটকের মূল বিষয়। নাটকটি

১৯৮৫ সালে মঞ্চায়িত হয়। মোট দুই রজনী নাটকটি অভিনীত হয়।
অভিনেতা/অভিনেত্রী: সমীর ঘোষ, অরিন্দম চক্রবর্তী, প্রশান্ত মৈত্র, নিমাই চক্রবর্তী।

৫। শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে অরুণ মুখার্জীর লেখা 'কংক্রিট' নাটকটি ১৯৮৫ সালে অভিনীত হয়। নাটকটি চার রজনী অভিনীত হয়।
অভিনেতা/অভিনেত্রী: প্রশান্ত মৈত্র, সমরেন্দ্র সরকার, অরিন্দম চক্রবর্তী, চন্দন দাস, নিলীমা সাহা, প্রমিলা সরকার, রতন সাহা, গৌর সাহা, সুকমল নাথ, ভাস্কর রায়চৌধুরী।

৬। চন্দন সেনের 'অরাজনৈতিক' নাটক ১৯৮৬ সালে মঞ্চস্থ হয়।

অভিনেতা/অভিনেত্রী : প্রশান্ত মৈত্র, সমরেন্দ্র সরকার, চন্দন দাস, নীলিমা সাহা, প্রমুখ।

৭। চিররঞ্জন দাসের 'ক্রীতদাস' ১৯৮৭ সালে অভিনীত হয়। মোট ৭রজনী অভিনীত হয়।
৮। মানিক বন্দ্যোপাধায়ের লেখা 'ছোটবকুল পুরের যাত্রী' ছোটগল্পের নাট্যরূপ দেন, অরূণ মুখার্জী। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার নাটক। নাটকটি মোট দশ রজনী অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি ১৯৮৮ সালে মঞ্চায়িত হয়।

অভিনেতা/অভিনেত্রী : সমরেন্দ্র সরকার প্রশান্ত মৈত্র, অরিন্দম চক্রবর্তী, চন্দন দাস, শ্রীতমা দেব, গৌর সাহা, হারান মজুমদার, ভাস্কর রায় চৌধুরী।

৯। হীরেন ভট্টাচার্যের নাটক 'খন্ডন' মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করার নাটক। নাটকটি ১৯৯০ সালে অভিনীত হয়। মোট দুই রজনী অভিনীত হয়েছিল।

অভিনেতা/অভিনেত্রী: অরিন্দম চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র সরকার, প্রশান্ত মৈত্র চন্দন দাস, সুতপা ব্যানার্জ্জী পুলকী সরকার প্রমুখ।

১০। 'বিষকাজল' নাটকটি হারাণ মজুমদারের লেখা। মানুষের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরূদ্ধে প্রচার মূলক নাটক। 'বিষকাজল' নাকটটি ১৯৯১ সালে অভিনীত হয় এবং মোট ছয় রজনী অভিনীত হয়েছিল।

অভিনেতা/অভিনেত্রী: প্রশান্ত মৈত্র, হারাণ মজুমদার, সান্তা দেব, শ্রীতমা দেব প্রমুখ।

১১। 'চাঁদনি রাতে' রবীন রায়ের অনুবাদ মূলক নাটক। কমিউনিষ্টদের প্রচারকে তৎকালীন সরকার নির্মম ভাবে দমন করার চেষ্ঠা করত। শোষণ, বঞ্চনা এত তীব্র হয়েছিল যে উক্ত সময়ে পুলিশ প্রশাসনও কমিউনিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এই পটভূমিতে লেখা 'চাঁদনি রাতে' নাটকটি। নাটকটি ২০০১ সালে মাত্র এক রজনী অভিনীত হয়েছিল।

অভিনেতা/অভিনেত্রী: সমরেন্দ্র সরকার, প্রশান্ত মৈত্র, দিলীপ সাহা, মনোজ গাঙ্গুলি, পিকলু দাস।

১২। মনোজ মিত্রের ‘পাঁকে বিপাকে’ হাস্য রসাত্মক নাটকটি ২০০২ সালে অভিনীত হয়। মোট পাঁচ রজনী প্রদর্শিত হয়েছিল নাটকটি।

অভিনেতা: সমরেন্দ্র সরকার, প্রশান্ত মৈত্র।

১৩। মনোজ মিত্রের ‘মহাবিদ্যা’ পূর্ণাঙ্গ নাটকটি ২০০৩ সালে অভিনীত হয়। নাটকটি রূপকধর্মী। রূপকের অন্তরালে রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।
অভিনেতা/অভিনেত্রী: সমরেন্দ্র সরকার, বরণ বিশ্বাস, চন্দন দাস, লব ভগৎ, অরিন্দম চক্রবর্তী, প্রশান্ত মৈত্র, পার্থ দাস, মনোজ গাঙ্গুলী।

১৪। ‘যা তারা পারেনি’ কিরণ মিত্রের লেখা মানবিক মূল্যবোধের নাটক। সাধারণ মানুষের বিবেক বুদ্ধি সাময়িক বিপদগামী হলেও কখনো তা আবার সঠিক পথে ফিরে আসে। এই বিষয়টি নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি ২০০৪ সালে প্রথম অভিনীত হয় এবং মোট চার রজনী অভিনীত হয়।

অভিনেতা: হারাণ মজুমদার, প্রশান্ত মৈত্র

১৫। ‘‘রত্নাকরের রামায়ণ’’ নাটকটি গুজরাট দাঙ্গার প্রেক্ষিতে শিবশর্মার লেখা নাটকটি ২০০৫ সালে অভিনীত হয়। নাটকটি মোট পনেরো রজনী অভিনীত হয়।
অভিনেতা: সমরেন্দ্র সরকার, প্রশান্ত মৈত্র, গৌড় সাহা, রতন সাহা, অরিন্দম চক্রবর্তী, চন্দন দাস, পার্থ দাস, সিদ্ধিনাথ সাহা, হারাণ মজুমদার।

১৬। ‘পালঙ্ক’ নাটকটির গৌতম চন্দ নাট্য রূপ দেন। একটি পালঙ্ককে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রীর বাতাবরণ তৈরি করা হল পালঙ্ক নাটকের মূল বিষয়। নাটকটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উত্তরাঞ্চলের নাটক প্রতিযোগিতায় ২০০৭ সালে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার পায়। নাটকটি ২০০৬ সালে প্রথম অভিনীত হয় এবং মোট ২৫ রজনী প্রর্দশিত হয়েছিল।

অভিনেতা/অভিনেত্রী: সমরেন্দ্র সরকার, চন্দন দাস, প্রশান্ত মৈত্র, পার্থ দাস, মনোজ গাঙ্গুলী, শ্রীতমা দেব, হারাণ মজুমদার প্রমুখ।

১৭। উৎপল দত্তের ‘মৃত্যুর অতীত’ নাটকটি মার্কসবাদকে কেন্দ্র করে রচিত। ২০০৮ সালে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি মাত্র এক রজনী অভিনীত হয়েছিল।
অভিনেতা/অভিনেত্রী: অরিন্দম চক্রবর্তী, গৌর সাহা, পার্থ দাস, সমরেন্দ্র সরকার, প্রশান্ত মৈত্র, রতন সাহা, চন্দন দাস, পিকলু দাস।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বালুরঘাট শাখা মোট ১৮টি পথ নাটক পরিবেশন করেছে।
(১) ভোট এড়াতে কেটে চল (২) আর আঁধারে লয়
(৩) ভোট দেবেন কাকে (৪) বাঁচার প্রতীক

(৫) রাজা কা বাজা
(৬) ভোট দিন বাঁচতে
(৭) ধাক্কা
(৮) শপথ
(৯) সকাল
(১০) মুখোশ
(১১) ফটোসেশন
(১২) সামিল
(১৩) ডাকাত এলো দেশে
(১৪) বালিশ
(১৫) আমরা করবো জয়
(১৬) নরকে গন্ডগোল
(১৭) লাফিং ক্লাব
(১৮) জবানবন্দী

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বালুরঘাট শাখার তিনটি নাটক ('গায়েন', 'শপথ', 'ক্রীতদাস') বাদে সকল নাটকপরিচালনা করেছেনে সমরেন্দ্র সরকার। দৃশ্যপাঠ অঙ্কনে সমরেন্দ্র সরকারের পরিকল্পনায় দলের সকলে করতেন। মেকআপ ম্যানের কাজ করতেন নালু পাল। কণ্ঠ শিল্পী হিসেবে প্রায় সমস্ত নাটকেই অরিন্দম চক্রবর্তী কণ্ঠ দিয়েছিল, মিউজিক সমরেন্দ্র সরকারের পরিকল্পনায় সকলেই করতেন।

২. ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শপথ শাখাঃ পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রায় ৩০০টি শাখা আছে। তার মধ্যে বালুরঘাট শাখার কর্মসূচী এতোবেশী ছিল যে একটি শাখার পক্ষে তা পালন করা, পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সমস্ত কার্যাবলী সুস্থ ও সঠিক ভাবে পালন করার জন্য আর একটি শাখার অনুভব হয় এবং সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই 'ভারতীয় গণনাট্য শপথ শাখা' সৃষ্টি হয় ২০০৫ সালে। আহ্বায়ক ছিলে হারাণ মজুমদার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতির মাধ্যমে সার্বিক জনচেতনা সৃষ্টি করা। সেই উদ্দেশ্যই পালিত হত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শপথ শাখায়। সর্বশিক্ষা, রক্তদান, AIDS, বাল্য বিবাহ, রোধ, পণপ্রথা প্রভৃতি সম্পর্কে জনসচেতনা গড়ে তোলা এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। হারাণ মজুমদারের ভাষায়,''আমরা চাই আমাদের নিঃশ্বাস ও মানুষের বিশ্বাস যেন একটি নি:শ্বাসে পরিণত হয়''[৩৭]। তাই তাঁরা রাস্তা খোলা স্থান যে কোনো জায়গায় জনসচেতনা মূলক নাটক গুলি পরিবেশন করেন। এই সংস্থার নাটক পরিবেশন করতে তেমন মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ শপথ শাখার প্রথম নাটক হারাণ মজুমদারে লেখা 'মশাল' (২০০৫)। নাটকটি দক্ষিণ দিনাজপুরের সমস্ত ব্লকে অভিনীত হয়েছিল। পথ এবং মঞ্চেও নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। শপথ শাখার অন্যান্য নাটকগুলি হল-

নাটক	**নাট্যকার**	**পরিচালক**	**সময়**
আমরা করব জয়	হারাণ মজমুদার	হারাণ মজমুদার	২০০৬
দুই চোর	হারাণ মজুমদার	হারাণ মজুমদার	২০০৭
গণজাতু	হারাণ মজুমদার	হারাণ মজুমদার	২০০৮

শপথ শাখার অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিরেন চন্দ্র দে, মিঠু দে, পুলক ঘোষ, স্বপন ব্যানার্জ্জী, হারাণ মজুমদার, শুভ্রশেখর মজুমদার প্রমুখ।

পাঁচের দশক থেকেই বালুরঘাটে অনেকগুলি ছোটবড় নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত নাট্যসংস্থা গুলির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে। এমন কতকগুলি নাট্যসংস্থা ছিল যারা জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই হারিয়ে গেছে কিন্তু তার অবদান বয়ে গেছে। তারা সৃষ্টি করেছে উৎকৃষ্ট অভিনয় শিল্প, উপহার দিয়েছে বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী সমৃদ্ধ করেছে অভিনয় শিল্পকে কিন্তু বর্তমানে তাদের সম্পর্কে বহুল তথ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য। বিভিন্ন স্থানীয় পত্র, পত্রিকা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকর্মীর স্মৃতি নি:সৃত তথ্যই একমাত্র অবলম্বন। আবার এমন কিছু নাট্য সংস্থা ছিল যেগুলি তৎকালীন নাট্যপ্রেমী বহু অনুরাগে গড়ে তুলেছিলেন তাদের কেবল নাম ছাড়া আর কোনো তথ্যই সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে কিছু নাট্যসংস্থার নাম কালানুক্রমে দেওয়া সম্ভব হল না। ছয় -এর দশকে নাট্যমন্দিরের অভিনেতা সুধীর দে 'প্রাচ্য ললিত কলা একাডেমী' নামে একটা সংস্থা গড়ে তোলেন। নাট্যমন্দিরের অভিনেতা অমলেশ মিত্র এর সঙ্গে যোগদেন। অল্প দিনের মধ্যেই সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়। 'কচিকলা একাডেমী', 'অভিযাত্রী', 'পূর্বাশা' অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে কয়েকটি নাটক অভিনয় করেছিল। ১৯৬৮ সালে প্রদোষ মিত্র, মিঠু চ্যাটার্জী, ভোলা সাহা প্রমুখ মিলে প্রভাস সমাজদারের উদ্যোগে কিরণ মিত্র রচিত 'অন্ধকার' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন 'চিরন্তন' -এর ব্যানারে প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায়। ১৯৭২ সালে নাট্যমন্দিরে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'চিরন্তন' এর প্রযোজনায় প্রদোষ মিত্র নির্দেশিত 'অস্তমিত গান' প্রশংসিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান প্রদোষ মিত্র। এই সংস্থায় প্রণব চক্রবর্তী নিদের্শে একটি আধুনিক নাটক 'সকালের জন্য' জনপ্রিয় হয়। অগ্নিবীনার 'ভূমিকম্পের পরে', 'মৃতজনের প্রাণ', 'নিহত শতাব্দী', অভিযাত্রী, নাট্যসংস্থার 'এ আমি চাইনি' সাড়া ফেলে দেয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাতাসে, মাটিতে যেন নাটকের গন্ধ। প্রত্যন্ত গ্রামেও নাটক মঞ্চায়ন করা ছিল মানুষের নেশা। জেলার বিভিন্ন স্থানে যে নাট্যসংস্থাগুলি রয়েছে সেগুলি হল -

যুবগোষ্ঠী	-	তিওড়
আনন্দ আশ্রম	-	হিলি
মিতালি	-	তপন
রূপকার	-	গঙ্গারামপুর
ত্রিনয়ন নাট্যসংস্থা	-	গঙ্গারামপুর
অগ্নিবীনা	-	বংশীহারী
শুভম	-	হরিরামপুর

গ্রামীন লোক সংস্কৃতি ও ভাষা উন্নয়ন সংস্থা - কুশমন্ডী

তপ:জাতি উপজাতি সাংস্কৃতিক সমিতি - কুশমন্ডী

আনন্দ আশ্রম নাট্যসংস্থা - তপন

সংকেত নাট্যসংস্থা - নয়াবাজার ।

তথ্যসূত্র:

১। ভবেশ বন্ধ্যোপাধ্যায় বিপ্লবীর দিনলিপি, প্রকাশক শিলা চক্রবর্তী, ৩৩ কলেজ রোড কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-২০২।

২। 'সারা বাংলা একাঙ্ক প্রতিযোগিতা -২০০০'- স্মরণিকা, সম্পাদক অমলেশ মিত্র, বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর। (বালুরঘাট নাট্যমন্দির প্রসঙ্গে-মুকুল বসু)

৩। সাক্ষাৎকার-অমলেশ মিত্র, ০৩.১২.২০১১।

৪। সাক্ষাৎকার- মিহির বরণ মুখোপাধ্যায়-১৬.০৫.২০১৫।

৫। 'সারা বাংলা একাঙ্ক প্রতিযোগিতা -২০০০'- স্মরণিকা, সম্পাদক অমলেশ মিত্র, বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর। (বালুরঘাট নাট্যমন্দির প্রসঙ্গে-মুকুল বসু)।

৬। সাক্ষাৎকার- হরিমাধব মুখোপাধ্যায়-২১.০৬.২০১৬।

৭। সাক্ষাৎকার- দীপক রক্ষিত-১৯.১২.২০১৫।

৮। সাক্ষাৎকার- সুরঞ্জন দাস ১৬.০৩.২০১৭।

৯। সাক্ষাৎকার- মিহির বরণ মুখোপাধ্যায়-১৬.০৫.২০১৫।

১০। সাক্ষাৎকার- প্রণব চক্রবর্তী-০৫.০৯.২০১৫।

১১। দীপক রক্ষিত-১৯.১২.২০১৫।

১২। 'হীরক জয়ন্তী উৎসব-১৯৭৩',স্মরণিকা বালুরঘাট নাট্যমন্দির, পশ্চিম দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-৭।

১৩। শতবর্ষে বালুরঘাট নাট্যমন্দির, ১৯০৯-২০০৮, স্মরণিকা, বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-১৯।

১৪। সাক্ষাৎকার- সমর সরকার-০৬.০১.২০১৮।

১৫। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ', ২৯শে আগষ্ট ১৯৮০, শিশির ঘোষ

১৬। 'কিছুকথা', পশ্চিম দিনাজপুর লেখক সমবায় সমিতির মুখপত্র, ১৫ই ভাদ্র ১৯৮৭, সম্পাদক মুকুল বসু, সংকলন দুই।

১৭। 'সত্যযুগ' বৃহস্পতিবার ৪ঠা চৈত্র ১৩৯৮, ১৮ই মার্চ ১৯৮২।

১৮। 'সাপ্তাহিক আনন্দলোক' ১১ই মার্চ ১৯৮২, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী।

১৯। 'পশ্চিমবঙ্গ', ২৬শে মার্চ ১৯৮২, রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র, শিশির চৌধুরী।

২০। 'অন্যদিন' পাক্ষিক পত্রিকা ১৭বর্ষ, ১৭ সংখ্যা ৩১শে আগষ্ট, ১৯৮২, ক্ষুদ্র পত্র- পত্রিকা পরিষদ, উত্তরবঙ্গ,Govt. of India R.N-32775/78।

২১। 'প্রতিলিপি' সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রথম সংখ্যা মাঘ, ১৩৮৫, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

২২। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-১৭ই কার্ত্তিক ১৩৮৯।

২৩। 'বালুরঘাট বার্তা'-০১.০৬.১৯৮৩, সম্পাদক পীযূস কান্তি দে, পশ্চিম দিনাজপুরের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

২৪। শ্রী অরুণ মজুমদার, জেলা তথ্য আধিকারিক পশ্চিম দিনাজপুর,

তাং ১৬.১১.১৯৮২।
২৫। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’, শুক্রবার ৯ই ভাদ্র ১৩৯০, বিপ্লব তালুকদার।
২৬। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’, ৩১.০৮.১৯৮৩ শুভ্রা দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রসরণী, শিলিগুড়ি।
২৭। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’, ০২.০৯.১৯৮৩ মধুমিতা চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি, প্রধান ডাকঘর।
২৮। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১।
২৯। ‘সাপ্তাহিক উত্তরবাংলা’-১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।
৩০। ‘বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা (১৯৪২-২০১১) ৭০ বৎসর পূর্তি উৎসব স্মরনিকা’, বোয়ালদাড়, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-৬৫।
৩১। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১।
৩২। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১।
৩৩। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১১।
৩৪। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা-১৩।
৩৫। সাক্ষাৎকার-প্রদোষ মিত্র-৩০.১১.২০১১।
৩৬। সাক্ষাৎকার-প্রণব চক্রবর্তী-০৫.০৯.২০১৫।
৩৭। সাক্ষাৎকার-হারাণ মজুমদার-২১.০৮.২০১৫।